সুসাহিত্য-সংগ্রহ

[অষ্টম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীতারাপদ সান্যাল, কাব্যতীর্থ
এম্.এ, বি এল্., বি টি.
ও
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় এল্.টি.

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত।
১১।১০।৩৪ তারিখের কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য।

সুসাহিত্য-সংগ্রহ

[নূতন সিলেবাস্ অনুসারে অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত]

কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক
শ্রীতারাপদ সান্যাল কাব্যতীর্থ, এম্.এ., বি.এল্., বি. টি.

ও

কলিকাতা হিন্দু স্কুলের বঙ্গসাহিত্য ও ইংরাজী ভাষার শিক্ষক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায় এল্. টি.
প্রণীত

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯৩৪

মূল্য ॥৶০ আনা

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

বিষয়		পৃষ্ঠা
যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (স্বামী বিবেকানন্দ)	...	১
হজরত মোহাম্মদ (রামপ্রাণ গুপ্ত)	...	৭
পৃথিবীর বয়স (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)	...	১৩
রাজা রামমোহন রায় (শিবনাথ শাস্ত্রী)	...	২০
শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)	...	২৭
নিউটনের কীর্ত্তি (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)	...	৩৩
কপালকুণ্ডলা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	...	৪০
শ্মশানে (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়)	...	৫১
আদিম আর্য্যজাতি (রমেশচন্দ্র দত্ত)	...	৫৬
মোহাম্মদ মহসিনের দয়া (কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য)	...	৬৬
মন্ত্রের সাধন (স্যার জগদীশচন্দ্র বসু)	...	৬৯
পালামৌ (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	...	৭৮
শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা (স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)		৮৬
মধুস্মৃতি (ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	...	৯৩
শাহ্‌নামা (মোজাম্মেল হক্)	...	১০১
পরিচ্ছন্নতা (ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	...	১০৬
কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	...	১১০
বিলাসের ফাঁস (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১১৩

পদ্যাংশ

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিদায় (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১২১
উষা (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)	...	১২২
পুরাতন ভৃত্য (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১২৩
বঙ্গভাষা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)	...	১২৬
বাংলা দেশ (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	...	১২৭
স্বর্গ ও নরক (সেখ্ ফজ্লল্ করিম)	...	১৩০
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর (কাশীরাম দাস)	...	১৩০
সুখ (কামিনী রায়)	...	১৩৬
মেঘনাদ ও বিভীষণ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)	...	১৩৯
হতভাগ্যের আক্ষেপ (চণ্ডীদাস)	...	১৪৪
বাঙ্গালা ভাষা (অতুলপ্রসাদ সেন)	...	১৪৫
দধীচির আত্ম-দান (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	...	১৪৭
অন্নদার আত্ম-পরিচয় (ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)	...	১৫১
খদিজা বিবি (সৈয়দ্ এমদাদ্ আলি)	...	১৫৪
ডেভিড্ হেয়ার (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	...	১৫৫
সীতা ও সরমা (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)	...	১৫৬
বুদ্ধের উপদেশ (নবীনচন্দ্র সেন)	...	১৫৯
কৃত্তিবাস (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)	...	১৬৩
ভারতের শিক্ষা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১৬৪
ভারতবর্ষ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)	...	১৬৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
নদী ও কাল (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)	...	১৬৮
শুষ্ক তরু (রাজকৃষ্ণ রায়)	...	১৬৯
যক্ষের আলয় (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	...	১৭১
সাধু নাসিরউদ্দিন (অজ্ঞাত কবি)	...	১৭৩
সাগর-তর্পণ (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)	...	১৭৫
পরিশিষ্ট	...	১৭৯

দ্রষ্টব্য :—ছাত্রগণের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে লেখকের ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

সুসাহিত্য-সংগ্রহ

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

(স্বামী বিবেকানন্দ)

যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে আরোহণের পর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ অতিবাহিত হইলে একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহাদের পরম সুহৃৎ, পরম আত্মীয়, তাঁহাদের আচার্য্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুন অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গমন্ করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পূর্ব্বশ্রুত শোক-সমাচারেরই সমর্থন করিলেন। শুধু কৃষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই জীবিত ছিলেন না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের শোকে মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন, আমাদেরও যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া মহা-প্রস্থানার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন। প্রাচীনকালে ভারতে রাজগণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে সন্নাসী হইতেন। মহাপ্রস্থান একপ্রকার সন্নাস-বিশেষ। জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ

মমতা ত্যাগ হইলে মানব এইরূপ সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাকে পানাহারবর্জ্জিত হইয়া কেবল ঈশ্বর-চিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ে চলিতে হয়। এইরূপ চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে।

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়াসমূহ পার হইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের পরপারে সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক। তথায় দেবগণ বাস করেন। কেহ কখন এ পর্য্যন্ত তথায় সশরীরে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী, স্বর্গ-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বল্কল পরিধানান্তর গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটি কুক্কুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয়ে উপনীত হইলেন ও ক্লান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে করিতে অবশেষে সম্মুখে সুবিশাল সুমেরু গিরি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে বরফ ভঙ্গিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না।

সকলের অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, "রাজন! দেখুন, দেখুন, রাজ্ঞী দ্রৌপদী ভূমিতলে পতিত হইয়াছেন।"
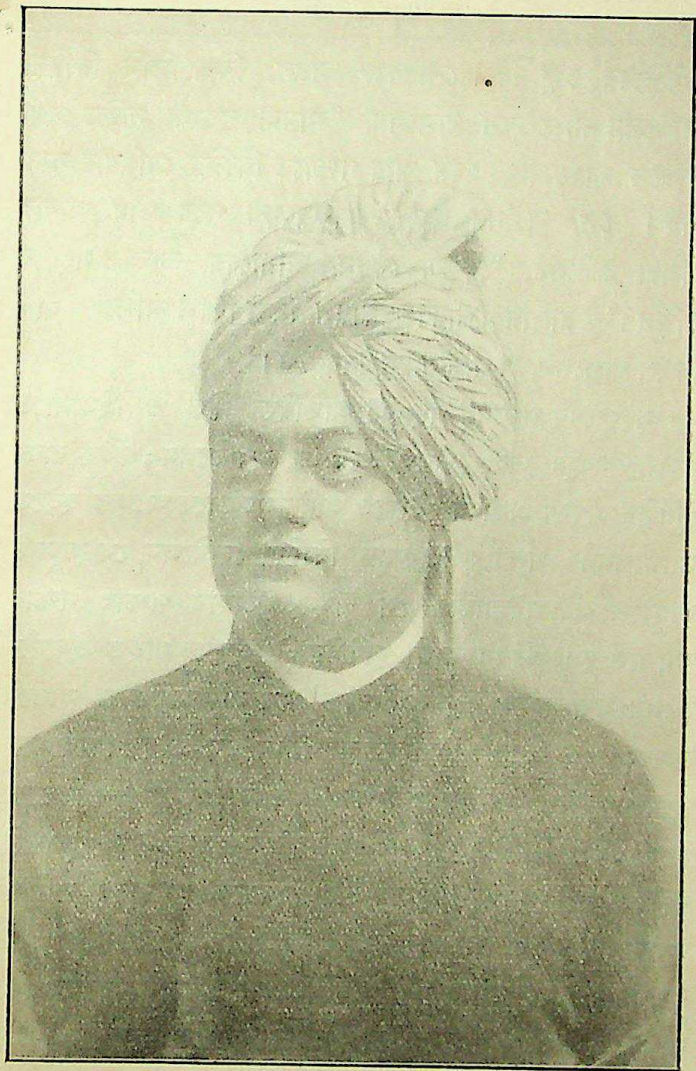
স্বামী বিবেকানন্দ

যুধিষ্ঠিরের চক্ষু দিয়া শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, অগ্রসর হও।" কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, দেখুন, আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।" রাজার শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি থামিলেন না। কেবল বলিলেন, "চল, চল, অগ্রসর হও।"

সহদেবের পতনের পর এই অতিরিক্ত শীত ও হিমানীতে নকুল, অর্জ্জুন এবং ভীমও একে একে পড়িলেন ; কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে একাকী হইলেও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে কুক্কুরটি তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে এখনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐ কুক্কুরের সহিত হিমানী-স্তূপের মধ্য দিয়া অনেক পর্ব্বত-উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে অবশেষে সুমেরু পর্ব্বতে সমাগত হইলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, দেবগণ এই ধার্ম্মিক রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার ইন্দ্র দেবরথে আরোহণ করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, এ পর্য্যন্ত তুমি ব্যতীত সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার আর কেহ পায় নাই।" কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলিলেন, "আমি

আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে না লইয়া স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত নহি।" তখন ইন্দ্র বলিলেন, "তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছেন।"

এখন যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণকারী সেই কুক্কুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, এস, রথে আরোহণ কর।" ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, "রাজন্, আপনি একি বলিতেছেন! কুক্কুর রথে আরোহণ করিবে! এই অশুচি কুক্কুরটাকে আপনি পরিত্যাগ করুন! কুক্কুর কখনও স্বর্গে যায় না। আপনার মনের ভাব কি? আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন? মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল সশরীরে স্বর্গ-গমনের অধিকারী।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সমুদয় সত্য; কিন্তু এই কুক্কুরটি হিমানী-স্তূপ লঙ্ঘনের সময় প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত বরাবর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আমার ভ্রাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল—সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করিল, কেবল এই একমাত্র আমাকে ত্যাগ করে নাই। আমি এখন উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?" ইন্দ্র বলিলেন, "কুক্কুর-সঙ্গী মানবের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুক্কুরটিকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে আপনার কোন অধর্ম্ম হইবে না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "কুক্কুরটি আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে আমি স্বর্গে যাইতে

চাহি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি শরণাগতকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি জীবন থাকিতে স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগের জন্য অথবা দেবতার অনুরোধেও ধর্ম্মপথ কখন পরিত্যাগ করিব না।” তখন ইন্দ্র কহিলেন, “রাজন্, আপনার শরণাগত কুক্কুরটি স্বর্গে গমন করে, ইহাই যদি আপনার একান্ত অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি এক কর্ম্ম করুন। আপনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, আর ও অশুচি, প্রাণি-হত্যাকারী, জীব-মাংস-ভোজী, হিংসাবৃত্তিপরায়ণ কুক্কুর। ও পাপী, আপনি পুণ্যাত্মা। আপনি পুণ্যবলে যে স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছেন, আপনি উহার সহিত তাহার বিনিময় করিতে পারেন।” রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, “আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুক্কুর আমার সমুদয় পুণ্য লইয়া স্বর্গে গমন করুক।”

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিবামাত্র যেন পট-পরিবর্ত্তন হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, তথায় কুক্কুর নাই, তৎস্থানে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম বর্ত্তমান। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “রাজন্! আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম, আপনার ধর্ম্ম-পরীক্ষার্থ কুক্কুররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আপনি যখন একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরকে আপনার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার জন্য নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে মহারাজ! আপনার জন্মে বসুধাতল ধন্য হইয়াছে। আপনি সর্ব্বপ্রাণীর

প্রতি অতিশয় অনুকম্পাসম্পন্ন, এইমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষয় সুখকর লোকসমূহ লাভ করুন। হে রাজন্! আপনি নিজ ধর্ম্মবলে ঐ সকল লোক উপার্জ্জন করিয়াছেন ;—আপনার প্রকৃষ্ট স্বর্গ-পদ লাভ হইবে।”

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় বিমানারোহণে ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণ-সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। প্রথমে তাঁহার নরক-দর্শনাদি কিছু পরীক্ষা হইল, পরে স্বর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর দেবদেহপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সকল দুঃখের অবসান হইল—তাঁহারা সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

হজরত মোহাম্মদ

(রামপ্রাণ গুপ্ত)

হজরত মোহাম্মদ প্রথমতঃ ত্রয়োদশ বৎসর মক্কায় বাস করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় পাবকশিখাসদৃশ উপদেশে কঠিনহৃদয় আরবদিগকে বিগলিত করিতে যত্ন করেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের ফলে মক্কায় অনেকে

ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং মক্কার বহির্ভাগেও কোন কোন স্থানে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু সমগ্র আরবের লোক-সংখ্যার তুলনায় ইস্‌লামধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। মোহাম্মদ ত্রয়োদশ বৎসরের সাধনায়ও সাফল্য লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী কোরেশদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া সশিষ্য মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মদিনার অনুরক্ত শিষ্যগণের সাহায্যে মোহাম্মদ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে রাজশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলেন। এই ধর্ম্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি ইস্‌লামধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ, সর্ব্বগ্রাহী সাম্যবাদ, উদ্দীপনাপূর্ণ বাগ্মিতা, নির্ম্মল চরিত্র, বিপুল সাহস এবং সুদৃঢ় সহনশীলতার কথা ক্রমশঃ আরব দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং তজ্জন্য আরব দেশের নানাস্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এই ভাবে আরব দেশের সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু মোহাম্মদের জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী কোরেশদের চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠে। মোহাম্মদ পঞ্চ বৎসর মদিনায় অতিবাহিত করিয়া সশিষ্য মক্কা-দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে তিনি কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি ইতিহাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। মোহাম্মদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বন্ধু আবুবকর বলিয়াছেন, "হোদায়বিয়ার সন্ধিস্থাপন জন্য ইস্‌লামধর্ম্মের যেরূপ প্রচার হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয়

নাই।” যে সকল ইস্‌লামধর্ম্মবিশ্বাসী, কোরেশদের হস্তে লাঞ্ছনার আশঙ্কায়, আপনাদের ধর্ম্মবিশ্বাস গোপন রাখিত, তাহারা হোদায়বিয়ার সন্ধিতে স্বাধীন ও প্রমুক্ত হইয়া প্রকাশ্যে ইস্‌লামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে। ইহাতে অসংখ্য নরনারীর কুসংস্কার দূর হয়; এবং তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। হোদায়বিয়ার সন্ধি-স্থাপনের পর মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য পারস্যরাজ, রোমক-সম্রাট্, মিশরের শাসনকর্ত্তা ও আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। ইহার ফলে এই সব দেশে ইস্‌লামধর্ম্মের পক্ষপাতী কতিপয় ব্যক্তির উদ্ভব হয়, এবং পারস্যরাজ্যের উপরিভাগ এয়মানের শাসনকর্ত্তা প্রজামণ্ডলীসহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিস্থাপনের এক বৎসর পর মোহাম্মদ পুনর্ব্বার মক্কা-দর্শন জন্য গমন করেন। এই সময়ে বহুলোক ইস্‌লামধর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন করে। ইহার পর বৎসর মোহাম্মদ মক্কার সমস্ত নরনারীকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মক্কায় একেশ্বরবাদ পরিগৃহীত হইবার পর অচিরে সমগ্র আরব দেশে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করে।

হজরত মোহাম্মদ বাহুবলের সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা এবং হজরত মোহাম্মদের গুণ-গ্রামই মুখ্যভাবে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল। আমরা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। হজরত মোহাম্মদ শেষ-বার দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মক্কায় প্রবেশ করিলে

পর, তাঁহার বিপুলবাহিনীর নিকট কোরেশেরা মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয় এবং শত্রুতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণা-বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ বিজয়ী বীরের ন্যায় মক্কায় প্রবেশ করিলে অধিনেতৃবৃন্দ দণ্ডভয়ে ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কি ভাবিতেছ?" তাহারা উত্তর করে, "হে ক্ষমাশীল পিতার পুত্র, আপনি আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।" হজরত মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে বলেন, "পুরাকালে ইউসফ্ উৎপীড়নকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি। তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না; ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছা করিলেই চলিয়া যাইতে পার।" হজরত মোহাম্মদের সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত মক্কাবাসী ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

হজরত মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানবজাতির কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ জীবনের আদ্যন্ত মধুময়। হজরত মোহাম্মদ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহশীল ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি প্রীতিমান্ ছিলেন। তিনি দাসদাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার তিরোভাবের পর

আনস নামক একজন ভৃত্য বলিয়াছিল, "আমি দশ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে কাজ করিয়াছি ; তিনি এক দিনের জন্যও আমাকে কটু কথা বলেন নাই।" বালকবালিকা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, অনেক সময়ে তাঁহাকে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া বালক-বালিকাদিগকে আদর করিতে দেখা যাইত। তিনি জীবনে কাহাকেও প্রহার করেন নাই। অভিসম্পাত বা কটুবাক্য এক-দিনের জন্যও তাঁহার রসনা কলুষিত করে নাই।

মোহাম্মদ পীড়িতের সেবা করিতেন, শবাধার দেখিলেই বহন করিয়া সমাধিস্থানে লইয়া যাইতেন, ক্রীতদাসের গৃহে সানন্দে ভোজন করিতেন, স্বহস্তে জীর্ণবস্ত্র সংস্কার করিয়া পরিধান করিতেন, অনেক সময় স্বয়ং গাভী দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎকালে হস্ত মর্দ্দন করিবার সময় তিনি কখনও প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত, বীরহৃদয় ও সত্য-নিষ্ঠ ছিল না। তিনি আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিতে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই নীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা ও দরিদ্রকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীনহীন ব্যক্তির গৃহেও অকুণ্ঠিতচিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে তাঁহাকে পথিমধ্যে ধরিয়া আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিত। একবার তিনি অনবসরবশতঃ একজন ধর্ম্মজিজ্ঞাসু অন্ধকে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ কারণ তিনি আমরণ অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, আমি ধর্ম্মজিজ্ঞাসু অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি। তিনি আহারে প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহার জীবনে এক দিনের জন্যও এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রবল শত্রুকেও অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিতেন।

হজরত মোহাম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। এক এক দিন তাঁহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে হইত। অনেক সময় কেবল খর্জ্জুর ও জল তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। কোন কোন রাত্রিতে তৈলাভাবে তাঁহার গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিত না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, "পরমেশ্বর তাঁহার নিকট পৃথিবীর ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখান করেন।"

ফলতঃ, আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মসুখ হজরত মোহাম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠনিমজ্জিত আরব-সমাজের উদ্ধার এবং বহুধা বিভক্ত আরব জাতির ঐক্যবন্ধন হজরত মোহাম্মদের প্রতি কার্য্যের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার অলৌকিক সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরব দেশে সত্যধর্ম্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই রশ্মির সম্পাতে আরব দেশের অন্ধকার

দূরীভূত হয় এবং তদ্দেশবাসিগণ ধর্ম্মে ও চরিত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। আরবগণ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ বিস্মৃত হয় এবং ঐক্যবলে অসাধ্য-সাধন করিতে আরম্ভ করে।

পৃথিবীর বয়স

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া বহুপরিমাণে আন্দাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। কেন না, জননী ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেই জন্যই জন্মকাল-নির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব! তথাপি যে জন্মকালনির্দ্ধারণ একেবারে অসম্ভব তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতাপ্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। পক্ক কেশের প্রাচুর্য্য ও লোল চর্ম্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরূপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কররেখা বা ললাটরেখামাত্র দেখিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালের রাশিনক্ষত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই পদ্ধতিরই কোনরূপ বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়াছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম ছয় হাজার বৎসর মাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠী-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত বিচার-প্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং তাঁহাদের গণনার সত্যতা বিচারে আমাদিগের অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজনামক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে যাহা ধার্য্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয় যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপর ইহারা দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলেন, জননীর বয়সের গাছপাথর নাই। আর এক দল বলেন, মাতার জন্মগ্রহণ, সে ত কালিকার কথা। প্রথম দল চর্ম্মের অবস্থা ও ভগ্ন দন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এই ত সেদিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল। সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধান দেওয়া যায়, তাহা

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখান যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্ত্তুলাকারা জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের বিন্যাস কিরূপ আছে, তাহা ঠিক জানি না; তবে ভিতরটা বড় গরম; এবং সময়ে সময়ে অন্তরিন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎস্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্‌গিরণ ঘটে, তাহা হতভাগ্য পুত্রকন্যার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, উপরের চর্ম্মখানা অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ডগুলি কোন রকমে কোলে পিঠে চাপিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্ম্মখানি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়;— কতকটা পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু, হায়! সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে আমাদের কত ভাইভগিনীর অস্থিকঙ্কালের অবশেষ সেই স্তরমধ্যে প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া, আমাদের নিজ পরিণামের জন্য দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে ফেলিতে হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সেই স্তরমধ্যে যাহাদের দেহাবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এককালে আমাদেরই মত দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু আকার প্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত প্রভেদ! তাহারাও আমাদের মত জীবধর্ম্মা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব!

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নহে, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া বাঁকিয়া

জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির বিন্যাসে একটা ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদের আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ বা উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, অদ্যাপি অসংখ্য স্রোতস্বতী জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড়পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া গুঁড়িয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ও সাগরগর্ভে প্রাচীন স্তরাবলীর উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর "সহস্রধারা" গতপ্রাণ "মৃতকায়" সহস্রজীবের কাক-শৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিশরদেশে নীলমুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কত কোটি বৎসর ধরিয়া কত নদনদী ভূপৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিতভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে, অতি প্রাচীন কালেও যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিতভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত তাহাতে সংশয় ঘটিবার সম্যক্ কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপর স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল আবরণখানি ধরণীর পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড় বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত

মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কতকালে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য্য হক্সলির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড় বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরে সেই আরণ্য উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণস্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সঙ্কোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিণত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য নদনদী মৃত্তিকা আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপরে বিন্যাস করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের পূরণ হইলে উহা আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ। আবার তদুপরি মৃৎস্তর। এইরূপে কতকাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃন্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে স্থানে ভেদ করিয়া পাথর কয়লা তুলিয়া স্বকার্য্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথর কয়লার স্তর দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে এইরূপ দুইশত আড়াইশত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে থাকে সজ্জিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

মনে কর, পঞ্চাশ পুরুষ উদ্ভিদের দেহাবশেষ জমিয়া পাথর কয়লার এক ফুট স্তর জন্মে; মনে কর, এক এক পুরুষ উদ্ভিদের

জীবনকাল গড়ে দশ বৎসর। তাহা হইলে এক ফুট স্তর জমিতে পাঁচশত বৎসর লাগিবে। পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তরের আড়াইশটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে ষাট লাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইবে।

মনে রাখিও পাথর কয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর বয়-সের এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। বুঝিয়া দেখ, পৃথিবীর বয়স কত!

ভূতত্ত্ববিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটী কোটী বৎসর নিমেষের মত। তাই ভূতত্ত্ববিৎ নিঃসঙ্কোচে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক একটা স্তরনির্ম্মাণে দশ-বিশ কোটী বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট-জ্ঞাতি মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। অন্ততঃ মানুষের উৎপত্তির অন্য কোন বিচারসঙ্গত বিধি কাহারও মাথায় আসে নাই। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্ততঃ গত লক্ষ বৎসরের মধ্যে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যতে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কট মহাশয়ের অভিব্যক্তি ব্যাপারে যে কত কোটী বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে!

রাজা রামমোহন রায়

(শিবনাথ শাস্ত্রী)

একটি তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি যে বৃষ্টি ঝটিকা সহিয়া যুগ যুগ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা কি শূন্যকে আশ্রয় করিয়া ? কখনই নহে। তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং যে সকল আভ্যন্তরীণ ধাতুপুঞ্জের সংঘাত দ্বারা তাহার দেহ গঠিত, সে ধাতুপুঞ্জও ঘন-নিবিষ্ট—এই জন্য ; তদ্ভিন্ন গিরি কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না। গিরি যে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা নিরন্তর প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া ; নিরন্তর বর্ষার জলধারা তাহার অঙ্গ-সন্ধিকে শিথিল করিতেছে ; তাহার দৈহিক ধাতু সকলকে ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে ; বহুল শিলাখণ্ড অশনি-নিনাদে শৃঙ্গ হইতে পাদদেশে পাতিত করিতেছে ; চক্ষের নিমিষে তরুলতা শ্রীসৌন্দর্য্য সকলই হরণ করিয়া লইতেছে ; আবার কখনও বা ভীষণ ভূকম্পে ঐ গিরিদেহ বিদারিত হইয়া জ্বালামুখী প্রকাশ পাইতেছে ; শত শত বনপ্রদেশ ভগ্ন ও বিশ্লিষ্ট হইয়া নেত্রের অগোচর হইয়া যাইতেছে ; কোথাও বা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, অবিশ্রান্ত জ্বলিয়া সুদূরপ্রসারী অরণ্য সকলকে ভস্মীভূত করিতেছে। গিরির জীবন কি সংগ্রামের জীবন ! কিন্তু এই

সংগ্রামের মধ্যেও গিরি দণ্ডায়মান আছে, শীতাতপ সহিয়া বিধাতার কাজ করিতেছে, গিরির ভিত্তি দৃঢ়, গিরির দেহের বন্ধন দৃঢ় বলিয়া। এ জগতে একজন মহামনা ব্যক্তিকে আমার এই গিরির সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কোন্ গিরি এমন আছে, যাহার শীতাতপের সহিত সংগ্রাম নাই? তেমনই, কোন্ মহৎ চরিত্র এমন আছে, বিধির প্রতিকূল অবস্থার সহিত যাহার সংঘর্ষণ নাই? আবার কোন্ গিরি এমন আছে, যে নিজের আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তার গুণে দণ্ডায়মান নয়? তেমনই কোন্ মহৎ চরিত্রই বা এমন আছে, যাহা আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের গুণেই মহৎ নয়?

এ জগতে যিনি উঠেন, তিনি সাধারণের মধ্যে জন্মিয়া সাধারণের মধ্যেই বাড়িয়া সাধারণের উপর মস্তক তুলিয়া দাঁড়ান; তিনি আভ্যন্তরীণ মালমশলার সাহায্যেই বড় হইয়া থাকেন। কুষ্মাণ্ড যেমন যষ্টির সাহায্যে মাটির উপরে উঠে, তেমনই কোন্ কাপুরুষ, কোন্ অলস শ্রমকাতর মানুষ, কেবল-মাত্র অপরের সাহায্যে এ জগতে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে? এ জগতে উঠিয়া পড়িয়া, রহিয়া সহিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া মানুষ হইতে হয়। মনুষ্যত্ব বা মহত্ত্ব লাভের অন্য পথ নাই। ঈশ্বর মানুষের সহিত চুক্তি করিয়া অল্প আয়াসে মহত্ত্ব প্রদান করেন না।

আমি ঐরূপ একটি মহৎ চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি রামমোহন রায়। নচিকেতা তাঁহার পিতাকে

বলিয়াছিলেন, "আমি শতজনের মধ্যে প্রথম হইতে চাই।" রামমোহন রায় যে কালে জন্মিয়াছিলেন, সে সময়ে এ দেশ-বাসীদিগের ভিতর লক্ষের মধ্যে, লক্ষের কেন কোটীর মধ্যে—তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? সে কালের লোকের কথাই বা বলি কেন? তাঁহার জন্মের পর এই ত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, কে তাঁহার স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? কে প্রকৃত মহত্বগুণে তাঁহার ত্রিসীমামধ্যে আসিতে পারিয়াছে?

বলিতে কি, শঙ্করের পর এরূপ মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ আর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত দিবা-লোকের নিকটে আমরা কি খদ্যোত নহি? আমরা কি সেই প্রদীপ্ত ধূমকেতুর পুচ্ছলগ্ন জ্যোতিঃকণিকামাত্র নহি?

কিন্তু রামমোহন রায় যে লক্ষের মধ্যে এক হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা কিরূপে? যেমন ক্ষুদ্র গিরিরাজির মধ্যে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই যে তিনি সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে উচ্চশির হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা কোন্ গুণে? তাহাও পূর্বোল্লিখিত গিরিদেহের ন্যায় আভ্যন্তরীণ উপাদান সকলের সাহায্যে।

প্রথম উপাদান, তাঁহার অন্তর্নিহিত অসাধারণ মানব-আত্মার মহত্বজ্ঞান। মানবের আত্মাকে তিনি অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত, তাঁহা হইতেই উৎপন্ন; তাঁহা দ্বারা বিধৃত এবং

তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই ইহার নিয়তি; ইহার আশা ও শক্তি অসীম। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব ও রাজনৈতিক অত্যাচার তিনি এই জন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, যে হেতু তদ্দ্বারা মানবাত্মা শৃঙ্খলিত, শক্তিহীন ও আত্ম-মহত্ত্ব-জ্ঞানে বঞ্চিত হয়। এই মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান আর একদিকে অসাধারণ আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রের এমন একটা প্রভাব ছিল, এমনই একটা মহাপুরুষোচিত গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাঁহাকে কোনও ছোট কাজের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার সমীপে ছোট কথার অবতারণা করিতেও সাহসী হইতেন না।

কেবল ইহাই নহে, মানবাত্মার মহত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে নিহিত ছিল বলিয়াই, তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। তাঁহার নিজের গূঢ় আত্মশক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না, কোনও বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে স্বকার্য্য-সাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহা ধরিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যাওয়া, ভয়প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাণভয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতাবশতঃ সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা, তিনি কাপুরুষতা ও নিজের শক্তির অবমাননা বলিয়া মনে করিতেন।

মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার

নাই। এ জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড় হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোট হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বাধা, বিঘ্ন, পাপ, প্রলোভন, জীবনের সমস্যা সকলেরই পথে উপস্থিত হয়; তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বড়; আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এই জন্য আমরা ছোট। তিনি যে উপরে উঠিয়াছিলেন, তাহারও ভিতরকার কথা, নিজের শক্তি-সামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।

দ্বিতীয় উপাদান, সকল মহাজনের কার্য্যের মূলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কার্য্যের মূলে ছিল। তাহা এই,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই বিশ্বাস। অর্থাৎ ইহা অনুভব করা যে, এই ভৌতিক জগৎ যেমন দুর্ভেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তেমনই মানবের জীবন ও মানবসমাজ দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্ম নিয়মের দ্বারা শাসিত। এক মহাশক্তি বা মহতী ইচ্ছা হইতে মানবজীবন ও মানবসমাজ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহতী ইচ্ছা দ্বারা বিধৃত হইতেছে, সেই ইচ্ছা ও সেই শক্তির দ্বারা মঙ্গলের পথে নীত হইতেছে। তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। মানবজীবন তাঁহারই দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহারই শাসনাধীন; সুতরাং এখানে ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি, ধর্ম্ম বলিয়া যাহা অনুভব করি, তাহার অনুসরণ করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ফলাফল সেই পরমপুরুষের

হস্তে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ ভাব হইতেই সকল ধর্ম্ম-বীরের বীরত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায়ের বীরত্বও ইহা হইতে উঠিয়াছিল, সে বীরত্বের কথা যখন স্মরণ করি, তখন হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি উপাদান উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা আপনার জীবনকে ও শক্তি-সকলকে ঈশ্বরের ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া অনুভব করা। আমার মানসিক বৃত্তি, দেহের বল, লৌকিক ও সামাজিক সুবিধা, সমুদয়ই সেই মঙ্গল-পুরুষের গচ্ছিত ধন, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে ব্যয় হইবার জন্য, তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য,—এই ভাব। ইহা ব্যতীত কোনও মহাজনের জীবন মহৎ হয় নাই, কোনও মানুষ এ জগতে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই। সকল মহামনা মানুষের জীবনে এক অপূর্ব্ব বাধ্যতার ভাব দেখা গিয়াছে। কে যেন তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া কাজ করাইয়া লইয়াছে, বাধ্য করিয়া খাটাইয়াছে; তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহা না করিয়া পার নাই। সেণ্টপল একস্থলে বলিয়াছেন, "The love of Christ constraineth me". অর্থাৎ যীশুর প্রেম আমাকে বাধ্য করিতেছে। কেবল পলই যে এই প্রকার বাধ্যতা অনুভব করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রত্যেক মহামনা মানুষ এইরূপ বাধ্যতা অনুভব করিয়াছিলেন। এই যে জীবনের ভিতরে দায়িত্বজ্ঞান, এই যে অস্ফুট কিন্তু নিরন্তরোদ্বেলিত বাধ্যতাজ্ঞান, ইহা ভিন্ন কে কবে

বড় হইয়াছে? কে কবে বজ্রমুষ্টিতে কার্য্য করিয়াছে? কে কবে বীরের ন্যায় সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে? রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন, 'যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, লোকে দেখুক আর না দেখুক, আমার জীবনের পূর্ণতা আমি লাভ করি; আমার প্রতি যে কার্য্যভার পড়িয়াছে, তাহা আমি সাধন করিয়া যাই।' তুমি আমি যদি বিশ্বাসে বা প্রেমে এতটা ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তুমি আমিও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া যাইতে পারিতাম। এই দায়িত্বজ্ঞান হইতেই তাঁহার চরিত্রের আর একটি গুণ ফুটিয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা পূর্ণাঙ্গ না করিয়া ছাড়িতেন না; যাহা করিবেন বলিয়া ধরিতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। বালকের ন্যায় লঘুভাবে কাজে হাত দেওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তৎপরে যেমন তাঁহার ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, তেমনই মানবের প্রতি উদার প্রেম ছিল। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-প্রীতি অপেক্ষা মানব-প্রীতিই অধিক পরিমাণে তাঁহার কার্য্যের চালক ও পোষক ছিল। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব হইতেই, তাঁহার উদার সার্ব্বজনীন প্রেম উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমগ্র জগতের দুঃখ সহিতে পারেন নাই, সেইজন্য দুষ্কর নরসেবাব্রতে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার জীবনের একটি মূলমন্ত্র উঠিয়াছিল, সেটি 'The service of man is the service of God'. অর্থাৎ মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহার মানব-প্রীতি অপরাপর অনেক মহাজনের মানব-প্রীতির ন্যায় সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করে নাই। তিনি যে সর্ব্বদেশের ও সকল জাতির নরনারীর দুঃখে দুঃখী হইতেন, সকল দেশের রাজনীতির প্রতি এত দৃষ্টি রাখিতেন, যে কোন জাতির কোনও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে যে এত আনন্দিত হইতেন, তাহার ভিতরকার কথা এই ছিল যে, তাঁহার প্রেম সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছিল।

শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রা

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলাসমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিপূর্ণ হইতেছে,

কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।" পরে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর বৃথা কালহরণ করিতেছ কেন?" এই বলিয়া তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।"

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া প্রিয়ংবদার নিকট গিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিতে লাগিলেন, "সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না।" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "সখি! তুমি যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইয়াছে দেখ! সচেতন জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ
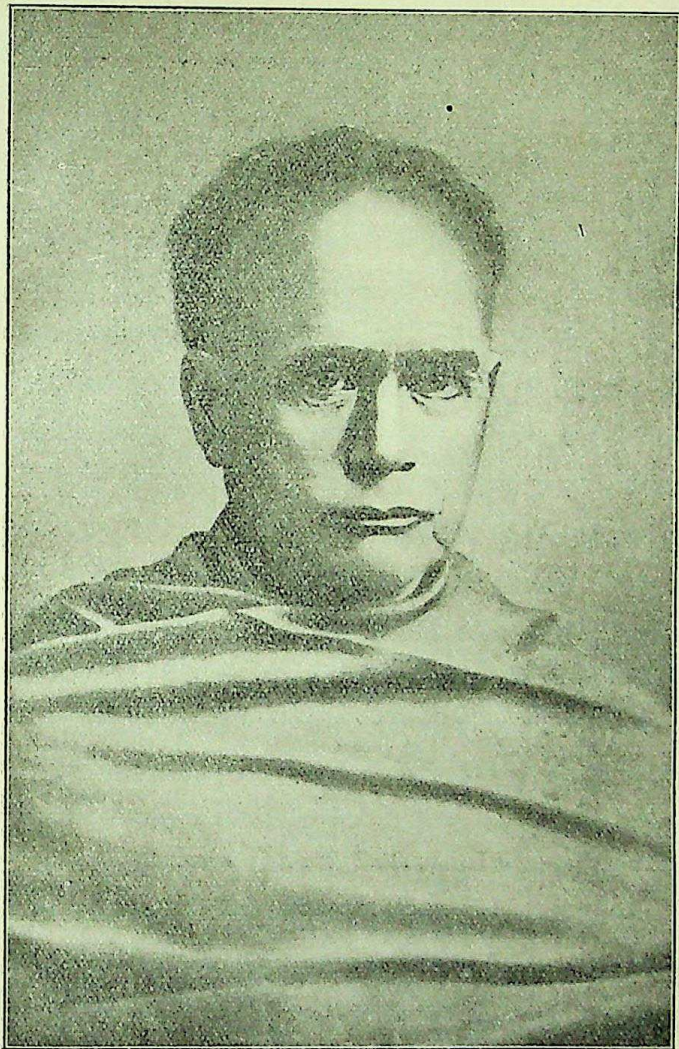
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হইতে পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে, কোকিল-কোকিলাগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে, মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিতেছে।”

কণ্ব কহিলেন, ‘বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়।’ তখন শকুন্তলা কহিলেন, ‘তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না।’ এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকট গিয়া কহিলেন, ‘বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম।’ অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, ‘সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম।’ তাঁহারা কহিলেন, ‘সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে অর্পণ করিলে বল?’ এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, ‘অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে!’

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, ‘তাত! এই হরিণ নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিতে ভুলিবে না বল?’ কণ্ব কহিলেন, ‘না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।’

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, 'আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে', এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, "বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোধন করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণ-শিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে।" শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, "বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম। এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, "বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে!"

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই, এ স্থলেই যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন।" কণ্ব কহিলেন, "তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই।" অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ

চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, "বৎস! শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে, আমরা বনবাসী, তপস্যায় কাল-যাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা! ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবে; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নহে।"

মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে; কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়-সখীব্যবহার করিবে, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না, স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলাচারিণী হইবে না। মহিলারা এইরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হন, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টক স্বরূপ।' ইহা কহিয়া বলিলেন, 'দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন?' গৌতমী কহিলেন, 'বধূ-দিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক?' পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, 'বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল কথা মনে রাখিও।'

এই উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, 'বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীগণকে আলিঙ্গন কর।' শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, 'অনসূয়া প্রিয়ংবদাও কি এখান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক।' কণ্ব কহিলেন, 'না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন।' শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, 'তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব!'—এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, 'বৎসে! এত কাতরা হইতেছ কেন?'

নিউটনের কীর্ত্তি

(রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

বড়লোকের কথা যে বলে ও যে শুনে, উভয়েরই পুণ্য-সঞ্চয় হয়। নিউটনের মত বড়লোক পৃথিবীতে খুব অল্প জন্মিয়াছেন; তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত অপরের কাজের তুলনা করিলে সন্দেহ হয়, এরূপ বড়লোক বুঝি আর জন্মে নাই;

সুতরাং নিউটনের কথা আলোচনা করিলে আমাদের সকলেরই কিছু কিছু পুণ্য-সঞ্চয় হইবে।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন গ্যালিলিওর নামও পণ্ডিত-সমাজে বিখ্যাত। গ্যালিলিও 'পেণ্ডুলম'যুক্ত ঘড়ী বাহির করেন। গ্যালিলিও আরও অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সে কথা বলিবার দরকার নাই। গ্যালিলিও খুব বড়লোক ছিলেন, কিন্তু নিউটন তাঁহার অপেক্ষাও বড়লোক।

নিউটনের প্রধান কাজ কি? তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন এক বাগানে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। এমন সময় গাছ হইতে একটা আপেল ফল নীচে পড়িল। অমনি নিউটন স্থির করিলেন, পৃথিবীর এমন একটা ক্ষমতা আছে, যাহার দ্বারা উহা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়। সেই ক্ষমতার নাম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। পৃথিবীর সেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে; তাহাতেই পৃথিবী অন্যান্য দ্রব্যকে আপনার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

এই গল্প হয় ত তোমরা শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু এই গল্প নিউটনের খ্যাতি না বাড়াইয়া বরং কমাইয়া দেয়। বস্তুতঃ, নিউটন ঐরূপ একটা কাজ কিছু করেন নাই।

প্রথমতঃ অনেকে সন্দেহ করেন, গল্পটা হয় ত আদৌ সত্য নহে। আপেল পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে কিরূপে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া নিউটনকে বহু বৎসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। একদিনে নিউটন অকস্মাৎ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; এবং বহু বৎসর এই বিষয়ের চিন্তা করিয়া তিনি মনুষ্যজাতিকে যাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাদিগকে এখন তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিব না; আশা করি, কালক্রমে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

তথাপি স্থূল কথা জানা ভাল। তোমরা যদি মনে কর যে পৃথিবীর একটা শক্তি আছে, তাহারই বলে পৃথিবী অন্য পদার্থকে টানে, আর অন্য পদার্থে সে শক্তি নাই, তাই তাহারা পৃথিবীকে টানিতে পারে না; তাহা হইলে তোমাদের সে বিশ্বাস ভুল। বস্তুতঃ নিউটন সেরূপ কিছু আবিষ্কার করেন নাই। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে পৃথিবী কোনও পদার্থকে স্বয়ং আকর্ষণ করিতে পারে, নিউটন তাহা নিজেই বিশ্বাস করিতেন না।

তবে নিউটনের বাহাদুরী কিসে? অন্য লোকে দেখে, ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও তেমনি ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে পৃথিবীও ফলকে টানে বা

আকর্ষণ করে; নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে। শুধু তাহাই নহে, অত বড় প্রকাণ্ড পৃথিবী ক্ষুদ্র ফলটিকে যে বলে টানে, ক্ষুদ্র ফলটিও প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ঠিক সেই বলে টানে। উভয়ের প্রতি টান উভয়েরই সমান।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে সে আবার কি? তবে পৃথিবী ফলের কাছে যায় না কেন? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন?

উত্তর এই,—পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক দূর কাছে আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়াও তাহাকে আপনার দিকে আনে।

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই। গাছের নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রও ঠিক সেইরূপ পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে। প্রভেদ এই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে না খসে, যতক্ষণ উহার বোঁটা শক্তভাবে উহাকে ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা পড়িতে পায় না; আর বোঁটাটি ছিঁড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ

ধরিয়া বা আট্‌কাইয়া নাই; তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে।

তোমরা হয় ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। বলিবে, কৈ, চন্দ্র ত কতদিন আমাদের মাথার উপর উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। চন্দ্র পড়ে কৈ?

কিন্তু আশ্চর্য্য হইও না। চন্দ্র বস্তুতঃ ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। যে দিন চন্দ্রের সৃষ্টি, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে এবং চিরকালই পড়িতে থাকিবে। অথচ তোমাদের মাথা ভাঙ্গিবার কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও অধিক দূর চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে। আমি এই পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া এই জিনিষটা বেগে ফেলিলে ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে; আরও বেগ দিলে হয় ত দুই তিন শত, কি দুই হাজার তিন হাজার হাত দূরে গিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। অধিক বেগ দিতে পারিলে হয়ত গঙ্গা পার হইয়া হাবড়াতে না হয় গুজরাটে, না হয় কাবুলে গিয়াই পড়িত। আমরা সেরূপ বেগ দিতে পারি না। তাই অত দূর যায় না। অধিক বেগ দিবার উপায় থাকিলে আমরা উহাকে কাবুল কেন, আফ্রিকা পার করিয়া

আট্‌লান্টিক মহাসাগরে ফেলিতে পারিতাম। যত দূরই যাউক পৃথিবীতে উহাকে পড়িতেই হইত। তবে আরও অধিক বেগ দিলে একেবারে পৃথিবীটা ঘুরিয়া আবার কলিকাতায় আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু একেবারে পৃথিবীর কাছ ছাড়া হইতে পারিত না।

মনে কর, চন্দ্রকে যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্ব্বমুখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, তাই চন্দ্র পূর্ব্বমুখে চলিতে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। চন্দ্রের যদি এই পূর্ব্বমুখে বেগটুকু না থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র এতদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আঘাত করিত। নারিকেল ফলটা মাটিতে পড়িলে আমাদের কিছু লাভ হয়। আর চন্দ্রের মত প্রকাণ্ড পদার্থটা মাটিতে পড়িলে আমরা কি, আমাদের পৃথিবীটাই হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইত।

একগাছি লম্বা সূতার এক প্রান্তে একটা ঢিল বাঁধ, ও আর এক প্রান্ত বাম হাতে ধরিয়া ঝুলাইয়া দাও। তারপর, ডান হাতের দুইটি আঙ্গুলে করিয়া ঢিলটিকে স্বস্থান হইতে খানিকটা সরাও ; সূতা গাছটি যেন বরাবর টানের উপর থাকে। ছাড়িয়া দিলে দেখিবে ঢিলটি আবার স্বস্থান-মুখে চলিল ; যেন সেই স্থানের দিকে তাহার একটা টান আছে। যেখানে ধর না কেন, ছাড়িয়া দিলে, আবার সেই স্থানেই যাইবে। কিন্তু এবার ঐরূপ সরাইয়া একটু পাশ দিয়া বেগে ছুঁড়িয়া দাও। এবার

দেখ, আর স্বস্থানে যাইতে পারিবে না ; তবে স্বস্থানকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। চন্দ্রের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ, রজ্জুবদ্ধ ঢিলের মত। পৃথিবী যেন তাহার স্বস্থান। চন্দ্র সেই পৃথিবীর দিকে যাইতে চাহে, তবে কে কবে তাহাকে পাশ দিয়া পূর্ব্বমুখে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাই স্বস্থানে, পৃথিবীর নিকট, যাইতে না পারিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

নিউটন প্রমাণ করেন, পৃথিবী যেমন নারিকেলটিকে আপনার কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্রকে ঠিক সেইরূপ সেই নিয়মে আপনার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে বাঁধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীতে বাঁধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে যাইবার যো নাই। তবে বলদ ঘানিগাছে দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা থাকে, তাই ঘানিগাছের দিকে তাহার টান। আর চন্দ্র পৃথিবীর দিকে সেইরূপ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে কোন দড়াদড়ি দিয়া বাঁধা আছে কি না তাহা আমরা জানি না। নিউটনও তাহার সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছুই বলিয়া যান নাই।

শুধু চন্দ্র কেন, স্বয়ং পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী কেন, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে ছোট, কোনটা বা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়, কলুর বলদের মত সূর্য্যের চারিদিকে

ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে সত্য, সূর্য্যে যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা আছে তাহা আমরা জানি না। হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

নিউটন আমাদিগকে এইটুকু চিনাইয়াছেন যে আম, নারিকেল যে নিয়মে ও যেরূপে পৃথিবীতে পড়ে, চন্দ্রও ঠিক সেই নিয়মে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে, আর পৃথিব্যাদি পদার্থও ঠিক সেই নিয়মে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে; অর্থাৎ এই যে একটা প্রকাণ্ড জগৎ, সূর্য্য যাহার মধ্যস্থল, সাড়ে চারি কোটি ক্রোশ দূরস্থিত পৃথিবী যে জগতে একটা সামান্য পদার্থ মাত্র, সেই জগতে সর্ব্বত্র একই নিয়মে এ উহার দিকে চলিতেছে, ও ইহার দিকে চলিতেছে, এ ইহাকে ঘুরিতেছে, ও উহাকে ঘুরিতেছে।

কপালকুণ্ডলা

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সাগর-সঙ্গমে

প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করিতেছিল। পর্ত্তুগিস্‌ ও অন্যান্য নাবিক-দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্‌ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহীগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবাপুরুষ, এই দুইজন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন, যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কিয়ৎকালের জন্য কথাবার্ত্তা স্থগিত রাখিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ কতদূর যেতে পার্‌বি?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়, যাহা জগদীশ্বরের হাত তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে? আপনি ব্যস্ত হইবেন না!"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না? বল কি! বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলে-পিলে সম্বৎসর খাবে কি?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে, পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আস্‌ব না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিবার বড় সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।"

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্দ্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, বৃদ্ধ তাহাই একাগ্রচিত্তে শুনিতে-ছিলেন।

একজন নাবিক অপরকে কহিতেছিল, "ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বার-দরিয়ায় পড়্‌লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝিতে পারি না।"

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ ভাবিলেন যে কোন বিপদ্ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে ?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে ; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিক-দিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না—পাছে বাহির সমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণের জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এজন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু নব্যযাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন। তখন নৌকামধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়েকটি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড় ! কেনারায় পড় ! কেনারায় পড় !"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথায়, তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন ?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্যযাত্রী কোন মতে তাহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিকদিগকে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় নাই,—প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে।

চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্, পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।” নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগত-প্রাণ। বেশী বাতাস নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলন-কম্প বড় জানিতে পারিলেন না, তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দ-বিন্যাসে কাঁদিতে লাগিলেন। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমন সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। কোলাহলের কারণ বুঝিতে না পারিয়া, যাত্রীরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, “কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?” মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, “রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙ্গা!” যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে। কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায়

প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে—এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত, কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি রবিরশ্মিপ্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনসহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সকর্দ্দম-নদী-জল-বর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন, তবে সৌভাগ্য এই যে উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে, নৌকার অনতিদূরে, এক নদীর মুখ, মন্দগামী কলধৌতপ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে নানাবিধ পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

উপকূলে

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে

জলোচ্ছ্বাস-আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিগণও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন। তখন নাবিকেরা তরী তীর-লগ্ন করিলে আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া একজন আমার সঙ্গে আইস!"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে।" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরমধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বন মাত্র। কিন্তু সে বন দীর্ঘবৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণ-যোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের

অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিকদূর গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদন-যোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল। নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না, সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার-বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না, এজন্য তিনি কোনমতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন ; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই কারণে নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল ; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্যকাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল, অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে। নৌকারোহিগণ এইরূপে কল্পনা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, তখন নৌকাদি

তীরবর্ত্তী থাকিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এজন্য তাহারা অতিব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতেই সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা যাহা চরে ছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল, "নবকুমার রহিল যে?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে, প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এজন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘমাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল। এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না। নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেক দূর আসিয়াছিলেন। এখন

নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরে রাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। একাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। তুইদিন অনাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ, নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত। তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশস্বীকার কি জন্য ?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস-নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহা-দিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাসে দিবে—কিন্তু যতবারই বনবাসে প্রেরিত হউক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?

শ্মশানে

(চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়)

এইখানে আসিলে সকলেই সমান। পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিত, মহৎ ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ইংরেজ বাঙ্গালী, এখানে আসিলে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক, সকল বৈষম্যই এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসোই বল, রামমোহন রায় বল, কিন্তু এমন সাম্যসংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বট-তলার নাটক-লেখক, একই মূল্য বহন করে! তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য-মহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভি-ভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার, আর পৃথিবীতে জয়যোগ্য স্থান নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে। যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, তাহা এই মাটিতে বিলীন

হইয়াছে—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণ-বংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্য-রজ্জুতে জুলিয়াস্ সিজার বাঁধা পড়িয়াছিল, তাহা এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জীবন? নদী-হৃদয়ে জলবুদ্বুদের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই উহা লয় পাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগাল-কুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে আমি কে? আমি কতটুকু?—আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার শোভা পায় না! তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি তাহা জানি না—কখনও দেখি নাই, হয়ত কখনও দেখিবও না। কিন্তু শ্মশান-ভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গ অপেক্ষাও বড়, এ স্থান পবিত্র।
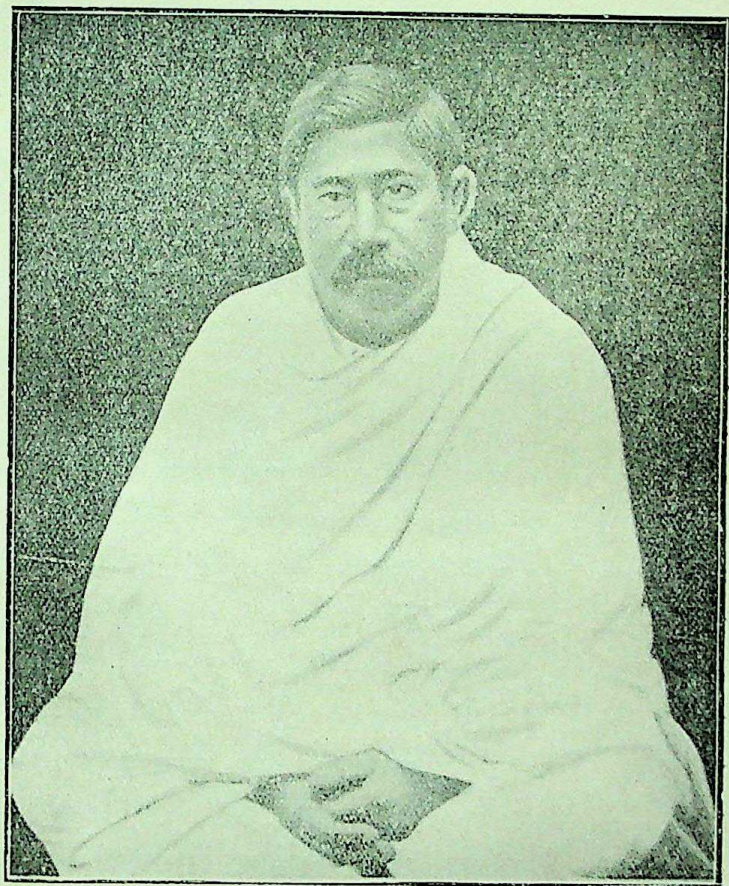
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

আর স্বার্থপরতা, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব এখানে অনুমিত হয়। সম্মুখে অসীম জলরাশি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। পদতলে বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে, সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরে অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধ সাগরবৎ, মদমত্ত-মাতঙ্গবৎ দুলিতেছে! যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দিকেই অনন্ত —আমি কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য! এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের জন্য এত আরাম, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা! এই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়! কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতি-মাত্রই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব— মনুষ্য মহান্। মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে— আবার, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরই ধ্বংস আছে! এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্য-জাতির লোপ হইবে সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না,

কেননা আমি মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয়, তাহাও পোড়ে,—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া সব লুপ্ত হয়। তাই বলি এ স্থান সুখের বটে, দুঃখের বটে—যে চলিয়া যায়, তার সুখ ; যে পড়িয়া থাকে তাহার দুঃখ। এ সংসারেরই ঐ নিয়ম— সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে ; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে ; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে ; জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছুই দেখিতে পাইবে না ; সকলই ভাল-মন্দ মিশ্রিত। সুতরাং প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন, সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা ; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি।

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান। চিরপ্রবহনশীল কালস্রোত, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছি, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও পাইবে না। উহা কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমি যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে; সেক্সপীয়ার গিয়াছেন, হ্যামলেট্ আছে; ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতা-ধ্বজা আজও উড়িতেছে; রুসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে।

আদিম আর্য্যজাতি

(রমেশচন্দ্র দত্ত)

অনুমান চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে আদিম আর্য্যজাতির বসতি ছিল। হিন্দু, পারসীক,
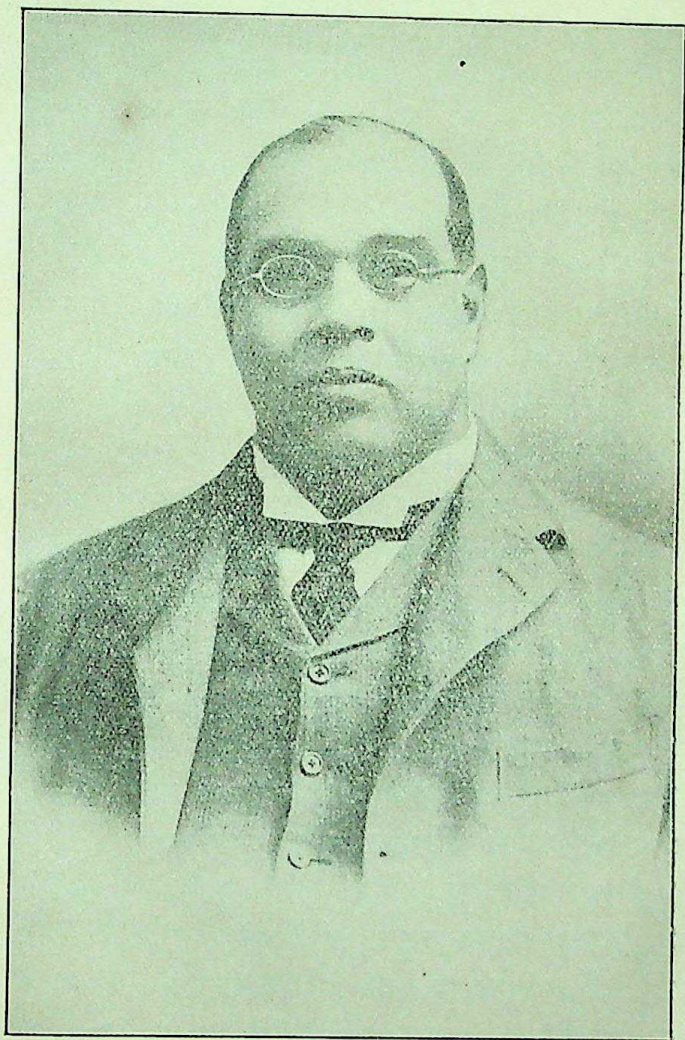
রমেশচন্দ্র দত্ত

গ্রীক, ইতালীয়, ফরাসী প্রভৃতি অনেক জাতি প্রাচীন আর্য্য-জাতি হইতে উৎপন্ন।

ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত আচার-ব্যবহার অনেকদূর নিরূপণ করিয়াছেন। মৃগয়া, পশুপালন ও ভূমিকর্ষণ এই তিন ব্যবসায় দ্বারা আর্য্যগণ জীবন-যাপন করিত। মৃগয়াজীবী ও পালিত-পশুজীবিগণ গৃহপ্রিয় ছিল না, এবং সর্ব্বদা একস্থানে বাস করিত না। ফলতঃ আধুনিক তাতার ও আরব জাতীয়গণ যেরূপ বহু পরিবার ও গৃহপালিত জীবজন্তুসমন্বিত হইয়া শিবির হইতে শিবিরান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে, ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ ভ্রমণ-পটু ছিল। কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত গৃহপ্রিয় ছিল, এবং স্বভাবতঃই নিজ নিজ ভূমিতে আসক্ত থাকিত। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকগণ এরূপ এক স্থানে বাস করিত না; পশুপালকগণ পশুর উপযোগী তৃণক্ষেত্র পাইবার জন্য ও মৃগয়া-ব্যবসায়ী নূতন নূতন বন্য পশুর অন্বেষণে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিত। আর্য্যগণ স্বদেশে এরূপ ভ্রমণপটু না হইলে গঙ্গা হইতে টেমস্-নদী পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিত না।

এইরূপ স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃই হউক, গৃহবিচ্ছেদ-কারণেই হউক, খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক, বা পূর্ব্ব দিকে তুরেণীয় জাতিদিগের আক্রমণ কারণেই হউক, আর্য্যগণ সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া নূতন বাসস্থান স্থাপন করিত

এবং বর্ব্বর জাতিদিগকে জয় করিয়া নূতন নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিত। এইরূপ গৃহনিষ্ক্রান্ত এক দল আর্য্যসন্তান আধুনিক ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হিন্দুগণ এই আর্য্যের সন্ততি।

পরাক্রান্ত আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে অতি অসভ্য জাতিসকল বাস করিত। ফলতঃ, এক্ষণে যে ভীল, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ পর্ব্বত ও জঙ্গলে বাস করে, তাহারাই আদিমবাসী ; তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এক কালে সমস্ত ভারতবর্ষে অধিবাস করিত। আর্য্যদিগের সহিত বহুশতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত ও দেশচ্যুত হইয়া তাহারা উর্ব্বর প্রদেশসমূহ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। নবাগত আর্য্যগণের, সিন্ধু পার হইবার অচিরকাল পরেই, এই আদিম অসভ্য জাতিদিগের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ছিল, আদিমবাসিগণকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া সকলেই ঘৃণা করিত, এবং কৃষ্ণকায়শত্রু-ধ্বংসের জন্য দেবতার নিকট সর্ব্বদা আরাধনা করিত। বহু শতাব্দীর ভীষণ যুদ্ধের পর আদিমবাসিগণ ক্রমে পরাজিত হইল, সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ আর্য্যদিগের হস্তগত হইল, বিজিত অসভ্য জাতিগণ অনেকেই আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিল, অবশিষ্ট অংশ অরণ্যে বা পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে লাগিল।

আদিম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে

যে, আর্য্যগণ সুসভ্য ছিল না, একেবারে বর্ব্বরও ছিল না। বর্ব্বর জাতিগণ বহুসংখ্যক ভূত ও পিশাচে বিশ্বাস করে, সুসভ্য জাতিগণ সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। প্রাচীন আর্য্যজাতি এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী। আর্য্যগণ বহু-ঈশ্বরবাদী ছিল; প্রকৃতির মধ্যে যাহা সুন্দর বা মহৎ বলিয়া বোধ হইত, তাহারই পূজা করিত। অনন্ত নীল নভোমণ্ডলকে দ্যৌঃ বলিয়া পূজা করিত, কখনও বরুণ বলিয়া সম্বোধন করিত। সূর্য্য ও অগ্নি আর্য্যদিগের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। এই জাতির মধ্যে কোনরূপ মন্দির বা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না; বরং স্পষ্টতঃই প্রতীতি হয় যে, পুরোহিত বা পৃথক্ উপাসকসম্প্রদায় ছিল না; আকাশ বা সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক পরিবারের শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ পুরুষ পূজামন্ত্র পাঠ করিত, এবং ফল-মূল বা দুগ্ধ দান করিয়া নিজ নিজ যাচ্ঞা প্রকাশ করিত।

ভারতবর্ষে আগমনের পর, এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্যকেই সমধিক পূজা করিত। ইন্দ্র আকাশের দেবতা, তিনি সোমরস পান করেন এবং মনুষ্যের উপকারের জন্য সর্ব্বদাই বৃত্র ও পণি প্রভৃতি অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। অগ্নি অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান করিযা যাগযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সূর্য্য মনুষ্যের হিতার্থ আলোক বিতরণ করেন। ফলতঃ, হিন্দুধর্ম্ম এক্ষণে যে আকার ধারণ করিয়াছে, সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যগণের

নিকট সে আকার পরিচিত ছিল না। স্থান, কাল ও সভ্যতা অনুসারে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়। কাল ও সভ্যতার গত্যনুসারে সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যদিগের সরল প্রকৃতি-পূজা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও সুন্দর সুন্দর উপন্যাসে বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়াছে।

আদিম হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিবিচ্ছেদ ছিল না, ধর্ম্মঘটিত অসমতাও ছিল না। আরাধনাপদ্ধতি সরল ছিল, উপাসক ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দান করিতেন, নিজের বা পরিবারের কুশল বা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করিতেন, গো-বৎস বৃদ্ধির জন্য আরাধনা করিতেন অথবা কৃষ্ণকায় অসভ্য জাতিদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজগৃহে পূজা-নির্ব্বাহার্থ একজন পুরোহিত নিযুক্ত থাকিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পূজকের গৃহই মন্দির, ইহা ভিন্ন অন্য মন্দির ছিল না। প্রথমে হিন্দুদিগের এইরূপ সরল ধর্ম্ম, এইরূপ সরল পূজা ও সরল বিশ্বাস ছিল।

কালক্রমে অনেক ধর্ম্ম-বিষয়ক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সমাজের প্রথমাবস্থায় সকলেই যেরূপ কৃষিকার্য্য, মেষপালনকার্য্য ও যুদ্ধকার্য্য সম্পাদন করে, পরে আর সেরূপ থাকে না; প্রতি ব্যবসায়-অবলম্বনকারী লোক একটি ভিন্ন শ্রেণী হয়। হিন্দুদিগের সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনা ঘটিল। জগতের অন্যান্য স্থানে যেরূপ, সেইরূপ এখানেও পূজকগণ একটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল, ব্রাহ্মণ-নাম ধারণ

করিল, ক্রমে পূজা-সম্পাদন-কার্য্য একচেটিয়া করিয়া লইল; সুতরাং আর কেহ ব্রাহ্মণকে না ডাকিয়া নিজের পূজা নিজে সম্পাদন করিতে পারিত না। পরাক্রান্ত গর্ব্বিত যোদ্ধা রাজগণও সামান্য লোক হইতে পৃথক্ হইয়া একটি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইল এবং ক্ষত্রিয়-নাম ধারণ করিল। সামান্য কৃষি বা বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ যোদ্ধা বা পূজকের ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইত না; তাহারা একটি অধীন শ্রেণীভুক্ত হইল, বৈশ্য-নাম ধারণ করিল। পরাজিত কৃষ্ণকায় অসভ্যগণের মধ্যে যাহারা হিন্দুদিগের দাসত্ব স্বীকার করিল, তাহারা শূদ্র-নাম ধারণ করিয়া আর্য্য-সন্তানদিগের দাস হইয়া রহিল।

এই জাতি-বিভাগ সহসা একদিনে সম্পাদিত হয় নাই; ক্রমে ক্রমে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এই বৃহৎ ঘটনাটি সম্পাদিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে রচিত ঋগ্বেদের সংহিতায় চারি জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের উল্লেখমাত্র স্থানে স্থানে দেখা যায়; কিন্তু শেষে রচিত অন্যান্য বেদে উপরি উক্ত চারি জাতির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু জাতি-ভেদ সম্পাদিত হইবার বহুকাল পর পর্য্যন্তও ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র-বিষয়ক প্রাধান্য স্বীকার করিত না। উপনিষদের অনেক স্থানে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেছে, ব্রাহ্মণগণ বিনীতভাবে তাহাই শিখিতেছে, এরূপ লিখিত আছে। পক্ষান্তরে, পরশুরামের উপাখ্যান হইতে উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে অনেকবার পরাস্ত

করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই সমস্ত বিরোধ লোপ পাইল, এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ নির্ণীত ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্য ব্যবসায়ে উৎকর্ষ বা প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিল। এই জাতি-বিভাগরূপ ভিত্তির উপর হিন্দুদিগের নব্য সমাজ সংস্থাপিত হইল।

যখন আর্য্যগণ প্রথমে সিন্ধুতীরে আসিয়া বাস করিল, যখন তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, ধৰ্ম্মঘটিত অসমতা ছিল না, যখন পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ঘৃত বা সোমরসের আহুতি দিয়া নিজের বা গোবৎসাদির বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্র বা অগ্নি বা সূর্য্যকে সরল চিত্তে আরাধনা করিত, তখন ঋগ্বেদের সরল কবিত্বপূর্ণ সংহিতা রচিত হয়। এই সময় আর্য্যদিগের জাতীয় জীবনে বিশেষ বল লক্ষিত হয়। বেদের সংহিতা সেই বলের ছায়ামাত্র। সেই বলে বহু উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া মেষপালকসমাজ ক্রমে জাতি-ভেদ-মূলক সভ্য হিন্দুসমাজরূপ ধারণ করে।

পরে যখন জাতি-বিভাগ হইল, যখন পূজক বা ব্রাহ্মণ জাতি প্রাধান্য লাভ করিল, যখন আড়ম্বরপূর্ণ পূজার বৃদ্ধি হইল ও ধৰ্ম্মান্ধতা প্রকাশ পাইল, তখন বেদের ব্রাহ্মণ-অংশ রচিত হইল। ব্রাহ্মণ-অংশে কবিত্ব নাই, সরলতা নাই, মানসিক ক্ষমতার পরিচয় নাই, কেবল আড়ম্বর। পূজক-প্রাধান্য-বৃদ্ধির সহিত জাতীয় জীবন ক্ষীণবল হইল ও চিন্তাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল; আর্য্যজাতির নূতন ও স্বাভাবিক উন্নতি পূজক-প্রাধান্য ও ধৰ্ম্মান্ধতায় বিনষ্ট হইয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে পূজক-প্রাধান্য অধিক দিন রহিল না। বেদ-বর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ প্রাধান্য লাভ করিল, তাহার প্রমাণ আছে। বেদের ব্রাহ্মণ-অংশে যেরূপ পূজক-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত উপনিষদ্-অংশে সেইরূপ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষদের অনেক অংশে দেখা যায় যে ক্ষত্রিয়গণ দর্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে এবং বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় জাতীয় চিন্তার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু কেবল শিক্ষায় ও চিন্তায় ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছিল, এরূপ নহে। যে জনক রাজা উপনিষদের একজন প্রধান শিক্ষাগুরু, তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য বিনষ্ট করেন, পরে দাক্ষিণাত্য ভেদ করিয়া সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়বল ও প্রাধান্য বিস্তার করেন। রামচন্দ্রের আখ্যানদ্বারা স্পষ্ট জানা যায় যে, জনক রাজা ও উপনিষদ্-রচনার সময়ে অর্থাৎ বেদ-বর্ণিত কালের শেষাংশে ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রবলে ব্রাহ্মণবলকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন।

বহুকাল পরে একজন ক্ষত্রিয় পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন ও মনুষ্যের সমতা প্রচার করিলেন। বুদ্ধের শিক্ষাবলে ভারতবর্ষ পুনরায় উন্নতি-সোপানে উঠিতে লাগিল। এই বৌদ্ধযুগে অশোক আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় একচ্ছত্র করিলেন। এই কালে ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হইল ও চিন্তাশক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ

করিল। এই কালে হিন্দু-নাবিকগণ বঙ্গসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যবদ্বীপের আবিষ্কার করিল এবং এই কালে শিল্পবিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ অট্টালিকা ও শিল্পকার্য্যে আচ্ছাদিত করিল। হিন্দুজাতির চিত্ত এই তৃতীয়বার আলোড়িত হইল।

পরে, খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভস্মরাশির উপর পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল; চিন্তাক্ষমতা পুনরায় উৎকর্ষ লাভ করিল, সমগ্র ভারতবর্ষে চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল। এইটি ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত বিপ্লব; এই বিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের অসাধারণ ধীশক্তি, কল্পনা ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়েই ভারতবর্ষের বিজ্ঞানশাস্ত্র উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং চীন-ভ্রমণকারী ভারতবর্ষের অর্থ ও সভ্যতা দেখিয়া ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া অসংখ্য পুস্তক লিখিয়াছেন, বেদান্তদর্শনের নূতন রূপ দান করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। ইহার পরই ভাস্করাচার্য্য ও লীলাবতী বীজগণিত প্রণয়নদ্বারা আপন আপন নাম চিরস্মরণীয় করেন। তাহার পর ভারতবর্ষ মুসলমান সভ্যতার করকবলিত হইল, হিন্দুসূর্য্য অস্তমিত হইল, তখন হইতে বহুকালাবধি হিন্দুদিগের মানসিক শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

মোহাম্মদ মহসিনের দয়া

(কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—পরিবর্ত্তিত)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের জীবনের ঘটনাবলী শ্রবণ করিলেও পুণ্য-সঞ্চয় হয়। মোহাম্মদ মহসিন আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি জগতে অতি বিরল। পরদুঃখমোচন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। সেই দয়াবান্ পরোপকারী মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিলে হৃদয় বিস্ময়াবিষ্ট ও ভক্তিরসে আপ্লুত হয়! তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা এস্থলে বর্ণিত হইল।

একদিন নিশীথকালে মহামতি মহসিন নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে এক তস্কর তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। মহসিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন। ধৃত হইয়া চোর নিজের আসন্ন বিপদের বিষয় ভাবিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনে মহসিনের হৃদয় ক্রমে দ্রবীভূত হইয়া আসিল। মহসিন চোরের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে যে এই পাপকার্য্যে নূতন ব্রতী, মহসিনের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মহসিন তস্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ দুষ্কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইলে?" সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,

"মহাশয়, আমি স্ত্রীপুত্র পালনার্থ অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজ-কর্ম্মের সুবিধা করিতে না পারিয়া, এই কুকার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অনাহারে নিপীড়িত স্ত্রীপুত্রের চক্ষের জল এমন অসহ্য হইয়াছে যে, আমি নরকে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত নহি। কেবল আমার নিজের ক্লেশ হইলে, এ পাপ না করিয়া অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিতাম।" চোরের কথায় মহসিনের হৃদয় গলিয়া গেল। প্রভাত হইবামাত্র মহসিন সেই কম্পিতকায় তস্করকে লইয়া, অপর একটি গৃহের মধ্যে গেলেন এবং একটি টাকার থলি খুলিয়া বলিলেন, "তুমি যে দ্রব্যের জন্য আসিয়াছ, তাহা সাধ মিটাইয়া গ্রহণ কর।"

চোর মহসিনের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিল এবং বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমি যে দুষ্কার্য্য করিতে আসিয়াছি, তাহার জন্য সম্পূর্ণ অনুতপ্ত। ক্ষতস্থানে আর লবণ নিক্ষেপ করিবেন না।"

মহসিন যখন দেখিলেন, চোর তাঁহার কথা বিদ্রূপবাক্য মনে করিতেছে, তখন তিনি তাহার বস্ত্র ভূমিতে পাতিয়া তাহাতে টাকার রাশি ঢালিয়া দিলেন ও তাহা বাঁধিয়া চোরের স্কন্ধে অর্পণ করিলেন।

চোর এবার ভয়ে একান্ত অধীর হইয়া পড়িল। সে মনে করিল, মহসিন এই টাকা সমেত তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করিবেন। তখন লঘুদণ্ডে অব্যাহতি পাইবার আর কোনই উপায় থাকিবে না। সে আরও কাঁদিতে লাগিল। হতভাগ্যের অবস্থা

দর্শনে মহসিনও কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "তুমি ভীত হইও না। তুমি যে চৌরকার্য্যে নূতন ব্রতী, তাহা তোমার আকার প্রকারে বুঝিতে পারা গিয়াছে। আমি পরিহাস করিতেছি না। তোমাকে অনুতপ্ত দেখিয়া ভগবান্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ও সেই জন্য, তাঁহার এই সেবককে অনুমতি করিয়াছেন, 'মহসিন, তুমি এই অনুতপ্তের সেবা কর'। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার স্কন্ধে বহুল অর্থ বাঁধিয়া দিয়াছি। তোমার যতদিন কাজকর্ম্ম না জুটিবে, ততদিন তোমার স্ত্রীপুত্র-দিগকে রক্ষা করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। তুমি এই অর্থরাশি লইয়া প্রসন্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাও। বৎস, এরূপ কার্য্যে আর কখনও প্রবৃত্ত হইও না।"

চোর গৃহে গমন করিয়া মহাত্মা মহসিনের দয়ার কথা অনবরত চিন্তা করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে তাহার চরিত্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। মহসিনের প্রতি তাহার এত অধিক ভক্তি জন্মিয়াছিল যে, প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে পূর্ব্বকৃত আত্মদোষ বর্ণন করিতে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। দয়ালু মহসিনের মহানুভবতায় তস্কর পরম সাধু হইয়া গেল।

মন্ত্রের সাধন

তড়িৎ ও ব্যোমযান

(স্যার জগদীশচন্দ্র বসু)

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের পঞ্জরে নির্ম্মিত। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞান দ্বারা যে কত অসাধ্যসাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্ব্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্ত্তমান উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোন নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের

চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুই দিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ইতালি দেশে গ্যাল্‌ভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙ্‌কে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ্‌টা নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল, "ব্যাঙ্ নাচান অধ্যাপক।" বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মরা ব্যাঙ্ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?" কি লাভ? যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তিদ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ী চলিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে,—দূর আর দূর নাই!
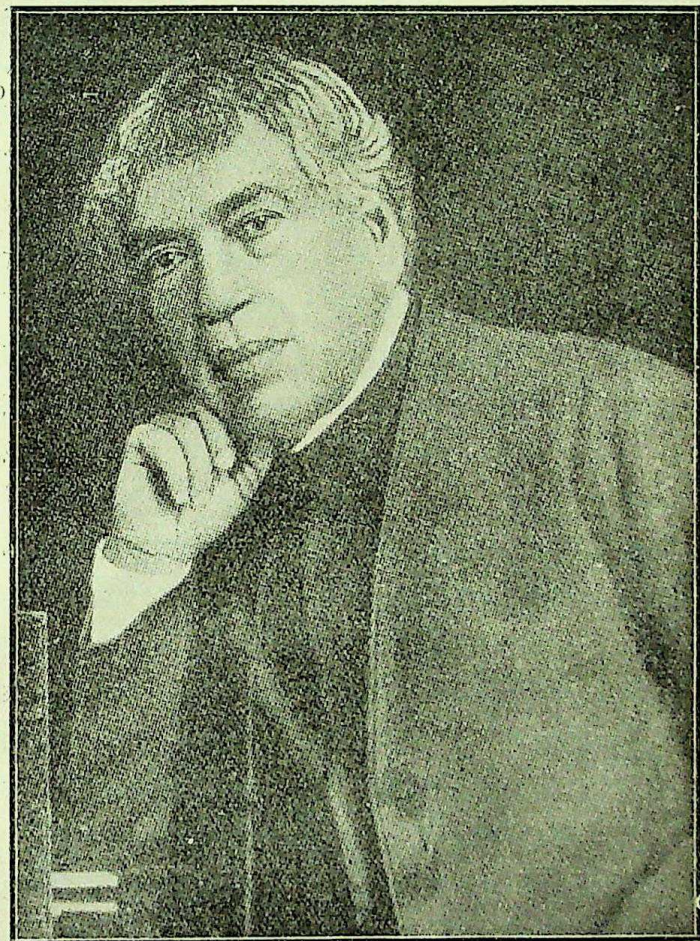
জগদীশচন্দ্র বসু

আমাদের স্বর বাড়ীর এক দিক্ হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথা বলিতেছি। এমন কি, এই শক্তির সাহায্যে দূরদেশে কি হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোন বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহু দিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস্ বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেসমের আবরণ হইতে গ্যাস্ বাহির হইয়া যায় বলিয়া বেলুন অল্পকাল মধ্যে অধঃপতিত হইত। সোয়ার্জ্জ নামে একজন জার্ম্মান এইজন্য এলুমিনিয়ম্ ধাতুর বেলুন প্রস্তুত করেন। এলুমিনিয়ম্ কাগজের ন্যায় হাল্কা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস্ বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতুনির্ম্মিত হইতে পারে ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসরব্যাপী নিস্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্ম্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে, এজন্য একটি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন।

জাহাজে যেমন জলের নীচে স্ক্রু থাকে, ইঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে

জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি বড় স্ক্রু নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্ম্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জ্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। যাহার জন্য তিনি সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এত দিনের চেষ্টা নিস্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জ্জের সহধর্ম্মিণী তখন জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জ্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে, কেহ তাহা বিশ্বাস করিল না। কেবল বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া সেই বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধবিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুর নির্ম্মিত বলিয়া রেসমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য ইঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিষ কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই অদ্ভুত কল কোন দিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে; আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে, সুতরাং অন্ততঃ নামমাত্র

পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে ; ওগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে একটু হাল্কা করিলে হয়ত দুই চারি হাত উঠিতে পারে। হায়! তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না। বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না ! যে কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল, তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ কলগুলির দ্বারা বেলুনকে, ইচ্ছানুক্রমে দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আর এক বাধা পড়িল। সোয়ার্জ্জের অবর্ত্তমানে বেলুন কে চালাইবে? অপরে কি করিয়া কলের ব্যবহার বুঝিবে? সে যাহা হউক, দর্শকদিগের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে সম্মত হইলেন। অদূরে বিধবা কলের প্রত্যেক স্পন্দন গণিতেছিলেন।

বেলুন পৃথিবী হইতে উঠিতে পারিবে কি? মৃত ব্যক্তির আশা-ভরসা এইবারে হয় পূর্ণ হইবে, নতুবা একেবারে নির্ম্মূল হইবে। কল চালান হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়িয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বহিতেছিল, কিন্তু প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এত দিনে সোয়ার্জ্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যে সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, অল্পকালের মধ্যেই তাহার আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে, কিন্তু তাহা সাম্‌লাইবার কল না থাকাতে, অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত
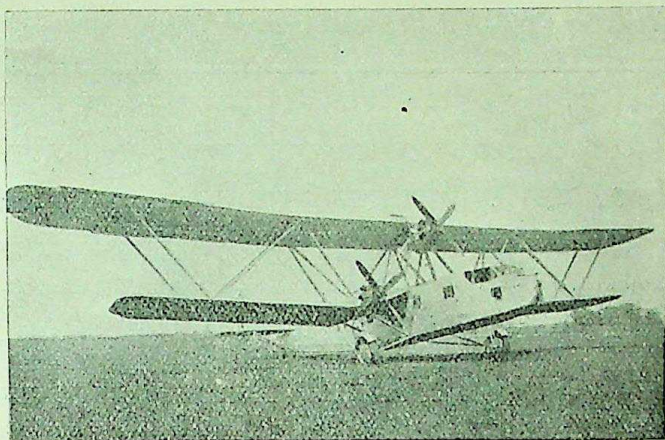
এরোপ্লেন
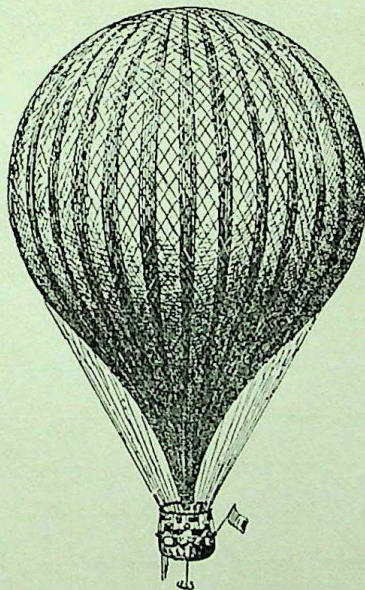
বেলুন

হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু এই দুর্দ্দশায় সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সোয়ার্জ্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিন হয়ত সফল হইবে। দশ বৎসরের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। জেপেলিন যে ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা যুদ্ধে ভীষণ অস্ত্র হইয়াছিল। যুদ্ধের পর এই ব্যোমযান আট্‌লান্টিক মহাসাগর অনায়াসে পার হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

পাখীরা কি সহজে উড়িয়া বেড়ায়! মানুষ কি কখনও পাখীর মত উড়িতে পারিবে? বড় বড় পাখীগুলি কেমন দুই চারিবার পাখা নাড়িয়া শূন্যে উঠে, তাহারা পাখা বিস্তার করিয়া চক্রাকারে আকাশে ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে মিলিয়া যায়।

তোমাদের কি কখনও পাখীর মত উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই? জার্ম্মানী দেশে 'লিলিয়ান্ থাল্' মনে করিলেন, আমরা কেন পাখীর মত আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিব না? তাহার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিদ্যা সাধন করিতে অনেক দিন লাগিবে। শিশু যেমন একটু একটু করিয়া অনেক চেষ্টায় হাঁটিতে শিখে, তাঁহাকেও সেইরূপ করিয়া উড়িতে শিখিতে হইবে। কিন্তু শিশু যেরূপ পড়িয়া গেলে আবার উঠিতে চেষ্টা করে, আকাশ হইতে পড়িয়া গেলে আর ত উঠিবার সাধ্য থাকিবে না,—তখন মৃত্যু নিশ্চিত! এত বিপদ্

জানিয়াও তিনি পরীক্ষা হইতে বিরত হইলেন না। অনেক পরীক্ষার পর নানা প্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল যে, দুই পাখার পরিবর্ত্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখার ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উড়িবার বেশী সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তাহাই ঠিক।

ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এই সব পরীক্ষা করিয়াছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহার কার্য্য শেষ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। এখন যে কল প্রস্তুত করিলেন, সময়াভাবে তাহা পূর্ব্বের মত দৃঢ় হইল না; তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উড়িতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, হঠাৎ বাতাসের ঝাপ্টা আসিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙ্গিয়া দিল। এ দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি যেসব পরীক্ষা দ্বারা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল।

তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। মার্কিনদেশে অধ্যাপক লাঙ্গ্‌লি পাখা-সংযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন; তাহাতে অতি হাল্কা একখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। পরীক্ষার দিন অনেক লোক দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মকারের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা

হইয়াছিল। ইঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় ঢিলা স্ক্রুটি খুলিয়া গেল এবং কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙ্‌লি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

যাহারা ভীরু, তাহারাই বহু ব্যর্থ-সাধনা ও মৃত্যুভয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। বীর পুরুষেরাই নির্ভীক চিত্তে মৃত্যু-ভয়ের অতীত হইতে সমর্থ হন। লাঙ্‌লির মৃত্যুর পর তাঁহারই স্বদেশী উইলবার রাইট্ উড়িবার কল পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল থামিয়া যাওয়াতে আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া রাইট্ পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টারই ফলে মানুষ গগন-বিহারী হইয়া নীলাকাশে তাহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পালামৌ

(সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

(১)

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল বিষয় স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই

লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন আমার পালামৌ যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূর; অতএব ম্যাপ্ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়োয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

তখন কতকগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘিরিল। "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন

জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহা সে জানে না। সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল। এই সময় আমার গাড়ী অপর পারে গিয়া উঠিল।

বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

অপরাহ্নে দেখিলাম একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই

পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা হইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়োয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থলে পনের মিনিটকাল দ্রুত পাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিবস প্রায় দুইপ্রহরের সময় হাজারি-বাগ পৌঁছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম।

যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরাজের হইবে বলিয়া আমার মনে হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় কয়েকজন বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে

আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন; না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতা-ব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, এজন্য প্রায় সকল বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। কোন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

(২)

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন, মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম।

ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল ; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তারপর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল ; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। পরে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড় ; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিম-দিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহার-গ্রামপার্শ্বে

একটি আছে। আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্ ঝর্ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয়, অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাঙ্গালার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনাকষ্টে কালযাপন করিবে, এমত সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেকস্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বন-বর্ণনায় যেরূপ, "শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেইরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের

দেশী কদম্ব বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি। খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই, বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে।

অল্প বিলম্বেই, অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল। প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটি গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আব্‌লুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; বক্ষে পুঁতির সাতনরী, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্‌সী ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল; মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু দেখিল, কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি, তাহা কেহই দেখিল না।

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা

(স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না, এবং লোক কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারে না। সত্যই "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদি উপায়। অতএব শারীরিক শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। এ স্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না; উপযুক্ত আহার-গ্রহণ, উপযুক্ত পরিচ্ছদ-পরিধান, যথাযোগ্য ব্যায়াম-অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্রাম লওয়া, যথাসময়ে নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি যে সকল কার্য্য দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষ-লাভের বিঘ্ন না হইয়া বরং সহায়তা হয়, তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞানলাভের জন্য এত শারীরিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবীর পক্ষে শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনের অধিক বিঘ্ন না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ঘটে না; এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম যথানিয়মে
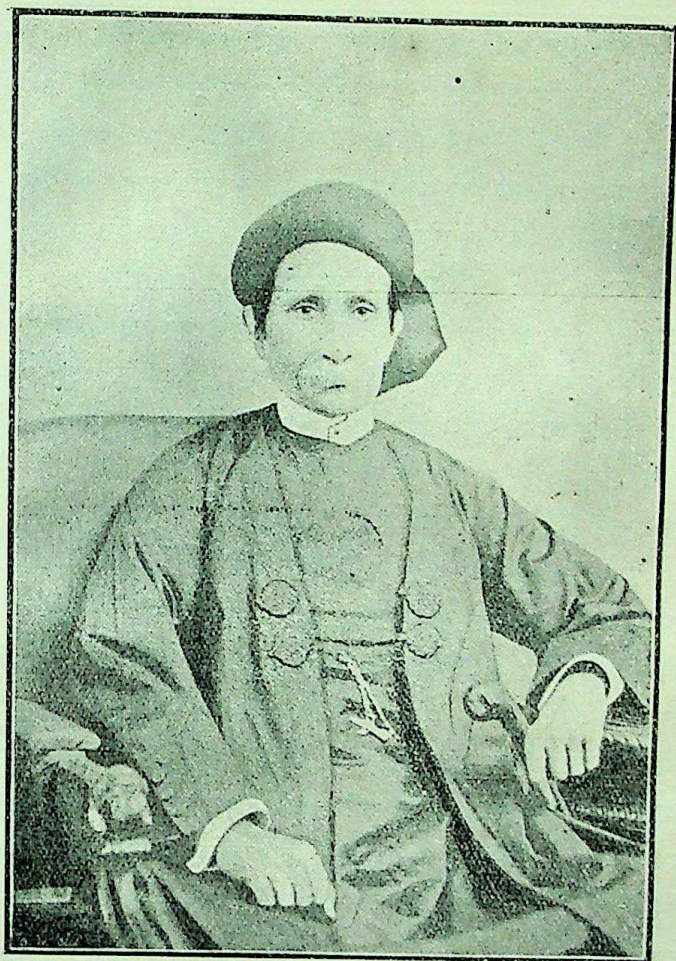
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও আহার নিদ্রার সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম।

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন সহ্য হয় এবং অনেক সহজ কার্য্য বিনা শারীরিক শিক্ষায় এক প্রকার চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়মপালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশ্যক বলা যায় না। নিয়মিত আহার, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দ্বারা অনেক দুর্ব্বল দেহ সবল হয়। হস্ত ও চক্ষুর সুশিক্ষা দ্বারা লোকে চিত্রকার্য্যে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে, শিক্ষা না করিলে চিত্র করা দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল-রেখাও টানিতে পারা যায় না।

মন যেমন শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ, মানসিক শিক্ষাও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয়। এস্থলে মানসিক শিক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানসিক শিক্ষা তদতিরিক্ত আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়; অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাভের শক্তি-বর্দ্ধন এই দুইটিই বুঝায়। উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মানসিক শিক্ষা লাভ হয়। যথা—দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে গেলে অভ্যাস দ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক্ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কেন না বিদ্যাশিক্ষা যদিও অনেক সময়েই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহা তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবচ্ছিন্ন এক বিদ্যা আলোচনাদ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা মনের সাধারণ শক্তির বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া যায়, এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে এক শ্রেণীর বিচিত্র লোক আছে তাহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাস-ভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষা কি? এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়? উৎসুক হইয়া সকলেই এই প্রশ্ন করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানসিক-শিক্ষা কেবল বিষয়-বিশেষের জ্ঞান-লাভ নহে, সকল বিষয়েই জ্ঞানলাভের শক্তি-বর্দ্ধন ইহার মূল লক্ষণ। সেই শক্তি-বর্দ্ধনের উপায়, নানা বিষয়ে যথাসম্ভব শিক্ষা, এবং সকল বিষয়ই যথাসাধ্য আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকলের সকল বিষয় সম্যগ্‌রূপে আয়ত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকা উচিত, এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি লাভ করা যায়। বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়। বিদ্যা অল্প থাকিলেও লোকের চলে, কিন্তু বুদ্ধি অল্প থাকিলে চলা ভার। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা না হইলে, জ্ঞানলাভ সহজ হয় না।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা

অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেও যাহার নীতি কলুষিত, সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থ ই বলিয়াছেন—

"দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥"

"দুর্জ্জন বিদ্বান্ হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলে কি সে ভয়ঙ্কর নহে?" নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয় তেমনই অতি কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দুর্নীতি কাহাকে বলে তাহা স্থির করা প্রায়ই সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন, তাহার কারণ এই যে, নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি দুর্নীতি, ইহা জানিলেই সম্পন্ন হয় না। কার্য্যতঃ যাহা সুনীতি তাহার আচরণ করা ও যাহা দুর্নীতি তাহার পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষালাভের লক্ষণ, এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে পারা বহু যত্ন ও অভ্যাসের ফল। ফলতঃ, নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম্মবিষয়ক। তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। যদিও দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জনের প্রকৃত জ্ঞানলাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে প্রকার যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক, তদুপযোগী মনের শান্তভাব দুর্নীত ব্যক্তিদিগের থাকে না। তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না। তাহারা সূক্ষ্ম কথা ধরিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ের স্থূল ও প্রকৃত অর্থ

বুঝিতে পারে না। তাহারা কুতর্ক করিয়া কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু সুযুক্তিদ্বারা সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোষ নাই, সেখানে তাহারা দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্রদৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। বোধ হয় এইজন্যই আর্য্যঋষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না। শান্ত, ঋজু এবং দম্ভবর্জ্জিত না হইলে কাহাকেও শিষ্য করিতেন না; অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেন না। আর একটি কথা আছে। দুর্নীত ব্যক্তির জড়জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানবৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। সুতরাং নৈতিক শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্টের বৃদ্ধি হয় এবং নীতিশিক্ষাদ্বারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে। সত্য বটে, নীতিশিক্ষাদ্বারা দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় না, কারণ তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের ঔষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। কিন্তু নীতিশিক্ষা যে আলস্য, অপব্যয়াদি-সম্ভূত দারিদ্র্য এবং অতি-ভোজন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-পারতন্ত্র্যাদি-জনিত রোগ-নিবারণের উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া দারিদ্র্য ও রোগ-নিবারণে সতত তৎপর থাকেন। আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দৈবদুর্ঘটনাদি যেখানে অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত দুঃখভার সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবার

ক্ষমতা নীতিশিক্ষা বিনা কিছুতেই জন্মে না এবং সেই ক্ষমতা এই সুখদুঃখময় সংসারে বড় অল্প মূল্যবান্ সম্পদ্ নহে।

এতদ্ব্যতীত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দৈব-দুর্ব্বিপাকাদি আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। প্রথমতঃ, আমাদের নিজের দুর্নীতিতে নিজের অশেষ দুঃখ ঘটে। অতিভোজনাদি অসংযত ইন্দ্রিয়-সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা, অতিলোভ, ঈর্ষ্যা-দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আমরা নিরন্তর তীব্র মনোবেদনা সহ্য করি। দ্বিতীয়তঃ, পরের দুর্নীতির জন্য অপমান, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদিদ্বারা অর্থনাশ, শত্রুহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ করি। রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুষ্যের দুর্নীতির ফল। অতএব, ইন্দ্রিয়সংযম ও দুষ্প্রবৃত্তি-দমন শিক্ষা না করিলে, কেবল বিজ্ঞানশিক্ষাদ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ঔষধ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না।

মধুস্মৃতি

(ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া, আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্ত-প্রায় হইয়াছে।

রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্রবাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই, পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল, কিন্তু, ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ্ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না; একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা,

পৃথিবীর আকার কি রকম ?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল ।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "গোলাধ্যায় পুঁথি খানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি ?" আমি সে স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতল-কলিতামলক-বদমলং বিদন্তি যে গোলং" । বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন ; এই দেখুন, তিনি বরং এই শ্লোকটিও আমাকে পুঁথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল ; তা তোমার বাবা বলিবেন বৈকি ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্রবাবুর সহিত আমার যখন এই সকল কথা হয়, তখন একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপে আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম । বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল ; দেখিতে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়-শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া
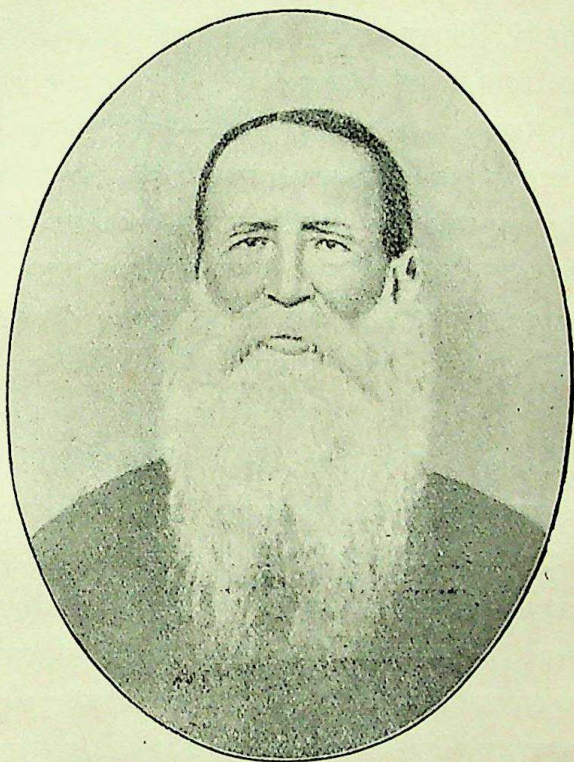
ভূদেব মুখোপাধ্যায়

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, 'তোমার নাম কি ? তোমার বাড়ী কোথায় ?" ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া, একে একে তৎকৃত প্রশ্নগুলির উত্তর দিলাম।

ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইহার সহিত আমার বন্ধুত্ব আরব্ধ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সহপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন। আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন; গায়ে, মাথায় ধূলা লাগিলে, চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ী আসিত, কিন্তু আমি কোনদিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য কোনদিন অনুরোধও করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাটীর ও মধুর পিতৃগৃহের আচার-ব্যবহার স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ, মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোনদিন করে নাই। ক্লাসে মধু ও আমি এক সঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সে খানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। বস্তুতঃ, উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা উভয়ে যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলের ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। মাসিক ৫৲ হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০৲ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন ; সুতরাং, এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দু কলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না ; অগত্যা আমার হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ করিবে ?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ ; ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে ? আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায়, আমাকে মধুর অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, আবশ্যক হইলে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতাম না ; কারণ আমি মধুকে আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েকজন সমপাঠী আমরা একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে

উন্নীত হইলাম। মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ্য পূর্ব্বের ন্যায় তখনও অক্ষুণ্ণ। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত ; কিন্তু আচার-ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথাবার্ত্তা হইত না—সে সকল বিষয় আমার নিকটে সযত্নেই গোপন রাখিত। কখনও কথা উঠিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু সে দিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখের চুলগুলা বড়, ঘাড়ের চুলগুলা ছোট। আমি বলিলাম, "এ কি করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস্ (genius), জিনিয়াস্ যারা, তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচচূড়া, কি সাতচূড়া, কি ন'চূড়া কাটিয়া আস্‌তে, তা হ'লে, যা হোক্ একটা নূতন রকম কিছু হ'তো ; তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মতন চুল কেটে এসেছ ! এরূপ নীচ অনুকরণ-প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।" আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধ হইল। সেদিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটু দূরে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে

জানিলাম মধু খৃষ্টান হইতে গিয়াছে ; শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। মধু যেদিন খৃষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর মধু স্মিথ্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিসপ্স্ কলেজে গমন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে মুখের ভাব, সে চক্ষুর জ্যোতিঃ কোথায় ? মধুর পূর্ব্ব আকারের এখন অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

বিসপ্স্ কলেজে কিছুকাল থাকিয়া মধু মাদ্রাজ যাত্রা করে। সেখানে যাইয়া আমাকে একখানি পত্র লেখে। পত্রখানির মধ্যে আমার মার কথার উল্লেখ করিয়া মধু লিখিয়াছিল, "আমার প্রণীত 'ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী'-নামক পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন করা হইয়াছে।" বাস্তবিকই আমার মা অতিশয় গুণবতী ও সুন্দরী ছিলেন। যে সৌন্দর্য্যে প্রকৃত মাতৃভাব ব্যক্ত হয়, সেই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই তাঁহার ছিল।

কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে। ঐ সময়ে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য, একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয় ; মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দি এবং উক্ত পদ আমারই হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা বলি, পরীক্ষায় ভাল হইলেই যে প্রকৃত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে।

মধু ও আমি যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, প্রায় সকল বারই আমি উহার উপরে হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদিগের মধ্যে অতুল্য ছিল বলিয়াই আমি জানিতাম।

নর্ম্ম্যাল স্কুলের উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই। তখনও সে 'পৃথিবী' লিখিতে 'প্রথিবী' লিখিত ; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই আমার নর্ম্ম্যাল স্কুলে থাকার সময়েই 'মেঘনাদ-বধ' প্রণয়ন করে এবং মধুর প্রণীত সেই মেঘনাদ-বধ কাব্য, অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া, আমি নর্ম্ম্যাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি।

মধু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই বেশী মনে করিত। এমন কি, সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, "তোমরা আমার জীবন-চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।" আমি মধুর কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভাসম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে বহু সহস্র ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের ন্যায় চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। ঠোঁট পুরু

এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দাও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না।

ইহার কিছুদিন পরে মধু "হেক্‌টর-বধ কাব্য" রচনা করে এবং কোনও কথা না জানাইয়া পুস্তকখানি আমারই নামে উৎসর্গ করে। অনেকদিন পরস্পরে সংস্রব-রহিত থাকিলেও আমার প্রতি মধুর বরাবরই যে একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল, উল্লিখিত উৎসর্গ ব্যাপার তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়।

শাহ্‌নামা

(মোজাম্মেল হক্)

প্রাচীন ভাষা পারসী অতি মধুর, মনোহর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষা! ইহার লালিত্য, সৌন্দর্য্য ও মৌলিকত্বের সহিত অন্য ভাষার ঐ সমস্ত বিষয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সুললিত

আরবী ও সংস্কৃত ব্যতীত্ প্রাচ্যদেশীয় অপর কোনও ভাষা সমকক্ষতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এই কারণবশতঃই পারসী ভাষা বিশ্ব-জগতের সভ্য সমাজে আদৃত ও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহার সাহিত্য-শাখা অতি বিশাল ও সুদূরপ্রসারিত। সেই বৃক্ষের সুধাময় ফল, সুন্দর সুরভি পুষ্প ও সুখপ্রদ স্নিগ্ধ ছায়া-সমন্বিত শাখাতলে উপবেশন করিলে অজ্ঞান জ্ঞানভূষিত, সন্তপ্তের তাপ বিদূরিত, দুর্নীতিজ্ঞ নীতিপরায়ণ, ভীরু ব্যক্তি উৎসাহশীল এবং নীরস হৃদয় মধুর রসাভিষিক্ত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই ভাষায় গভীর গবেষণাপূর্ণ যত মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, বোধ হয় জগতের অন্য কোন ভাষায় তাদৃশ নাই। সুতরাং ইহাকে বিবিধ সদ্গ্রন্থের মহামূল্য আকর বলা যাইতে পারে। সেই আকরের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ম্ময় কোহিনূর মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'। 'শাহ্‌নামা'র তুল্য চিত্ত-চমৎকারী হৃদয়োন্মাদক সুবৃহৎ ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ অতি বিরল। সেই কারণেই অধুনা পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য সমাজে 'শাহ্‌নামা'র সমধিক আদর ও গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কোন সভ্য জাতি নাই, 'শাহ্‌নামা' যে জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারের শোভা বর্দ্ধন করে নাই, এমন কোন সভ্য সমাজ নাই, যে সমাজ 'শাহ্‌নামা'র স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে, অনুপম রচনা-লালিত্যে ও অপূর্ব্ব বিষয়মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ নহেন। আর না হইবেনই বা কেন? স্বয়ং গজনীপতি মহামতি সুলতান মাহ্‌মুদ-বিন-সবক্তগীন ষষ্টি

সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা ও বহুমূল্য হস্তী খেলাতাদির বিনিময়ে যে গ্রন্থের গুরুত্ব পরিমাণ করিয়াছিলেন, সে গ্রন্থের সম্যক্ আদর ও গৌরব না হইবে কেন? তাই বলিতেছি, যতদিন জগৎ সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত থাকিবে, যতদিন কবি ও কাব্যের সম্মান থাকিবে, যতদিন পারস্য-সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন কোন ক্রমেই এই মহাগ্রন্থের চিরন্তন উচ্চ মর্য্যাদার অণুমাত্রও অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে 'শাহ্‌নামা' কি? তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সেই কাব্যের ভাষা সুমিষ্ট, সুমার্জ্জিত এবং নির্ম্মল-সলিল প্রস্রবণের ন্যায় অবাধ ও অনিবার্য্য তর তর গতিতে প্রবাহিত। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তদ্দেশীয় পূর্ব্বতন নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকলাপ, আচার-ব্যবহার, সমর-কৌশল, শাসন-প্রণালী, বিদ্যা, বদান্যতা এবং তাৎকালিক লোক-চরিত্র, ক্রীড়া-কৌতুক, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়; সুতরাং 'শাহ্‌-নামা'কে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের একখানি সুবৃহৎ দর্পণ বলিলেও বলা যাইতে পারে। পাঠক এতৎ পাঠে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই নব রসের জীবন্ত প্রতিমা-সমূহ দর্শন করিয়া কখন করুণরসে দ্রবীভূত হইয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, কখন বীরপুরুষগণের সুদুর্ল্লভ শৌর্য্য-বীর্য্য অবলোকনে বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া অতুল উৎসাহে স্ফীত হইয়া

উঠিবেন, কখন বা পাপের কালিমাময় বীভৎস চিত্র দর্শনে স্তম্ভিত, ভীত ও বিস্মিত হইয়া অধোবদনে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিবেন, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারি। ফলতঃ, 'শাহ্‌নামা' যে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই সম্যক্ সন্তোষদায়ক গ্রন্থ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

এই মহাগ্রন্থ ষষ্টিসহস্র শ্লোকে গ্রথিত—রচয়িতা মহামনস্বী কবিবর মওলানা শেখ আবু অল কাসেম ফেরদৌসী তুসী। ফেরদৌসী তুসী পারস্যসাহিত্য-গগনের সংখ্যাতীত নক্ষত্রমধ্যস্থিত সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ এবং তাঁহার কবিতামালা কাব্য-জগতের নন্দনকাননের সুদৃশ্য এবং সুরভি পারিজাতপুষ্পসদৃশ। তাঁহার মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' সমুজ্জ্বল রত্নখনি হইতেও শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্। যে কাব্যের এত গুণ, এত সুখ্যাতি, এত গৌরব এবং যে কবির এত সম্মান, এত আদর, এত প্রতিপত্তি, যিনি অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি", এই মহাবাক্যের জ্বলন্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাকে ইউরোপীয় মনীষিগণ প্রাচ্য-রাজ্যের হোমার (The Homer of the East) নামে অভিহিত করিয়াছেন, যিনি মহাকাব্যরচনা-মাহাত্ম্যে পারস্য-কবিকুলের শীর্ষস্থলে আসীন, সময়ের বিবর্ত্তনে যিনি ইংলণ্ডের কবি স্পেন্সার ও ইটালীর কবি দান্তের জীবনের অবস্থাভাগী হইয়াছিলেন, চরিত্র-বর্ণনে যিনি কোন কোন স্থলে মিল্টন ও সেক্সপীয়র হইতেও সিদ্ধহস্ত, যিনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব-বলে নবরসে গঠিত করিয়া ভুবন-বিখ্যাত 'শাহ্‌নামা'র প্রাণপ্রতিষ্ঠা

করিয়া গিয়াছেন, সেই পারস্য কবিকুল-শিরোমণি অমর পুরুষ মহাত্মা ফেরদৌসীর অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী অবগত হইবার জন্য কাহার না ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মিতে পারে?

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ফেরদৌসীর বাল্য-জীবনের ইতিহাস সন্তোষজনকরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন বৈচিত্র্যময় ঘটনাপুঞ্জে পরিপূর্ণ। সেই সকল ঘটনায় কবির অকৃত্রিম স্বদেশ-বৎসলতা, অচিন্তনীয় পরদুঃখ-কাতরতা, অনুপম উচ্চ-হৃদয়তা, অমানুষিক তেজস্বিতা, অতুলনীয় ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, অদ্ভুত প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্ব এবং বিপদে অসমসাহসিকতা, নির্ভীকতা ও কার্য্য-তৎপরতার বিষয় বিশদভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যদি তিনি ঐ সমস্ত সদ্‌গুণাধিকারী না হইতেন, যদি তাঁহার অন্তঃকরণ সদাচার, সৎসাহস ও কোমলত্বে সুগঠিত না হইত, তাহা হইলে তিনি পরিণামে একজন প্রথিত-নামা পণ্ডিত বলিয়া কখনই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন না এবং সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁহার নির্ম্মল যশের উচ্চ নিনাদে কখনই প্রতিধ্বনিত হইত না।

পরিচ্ছন্নতা

(ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন, সেই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী, তাহাকে পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। পৃথিবী কিছু নয়, শরীর কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে। দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি এবং স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদের অবশ্য করণীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতা এবং পরিচ্ছন্নতার একটি আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুরঘর যে ভাবে রাখ, আবাসের সকল ঘর সেই ভাবে রাখিলেই হইল। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর কি ঠাকুরঘর নয়?

বস্তুতঃ শুচিতাপ্রিয় ইহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহ এবং গৃহোপকরণ-সমূহ অতি সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার বিষয় উহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আদেশ আছে এবং ইহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের আদেশ-সমূহ ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়, উহা ধর্ম্ম্য, স্বাস্থ্যকর এবং সুখপ্রদ। কিন্তু এ কথাও বলি, পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া, সম্যক্ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্যই পরিচ্ছন্নতা-সাধনের মূলমন্ত্রগুলি, লক্ষ্মী-সাধনের মূলমন্ত্র হইতে অভিন্ন। ঐ মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি-সঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার। গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলেই তাহা-দিগকে ছড়াইয়া রাখিবার উপায় নাই। দ্রব্যাদি যথাস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয় এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।

সকল দ্রব্য হইতেই কোনও না কোনও প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। ছেঁড়া নেকড়া, কুট্‌নার খোসা, ঘরের আবর্জ্জনা —এরূপ পদার্থও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ছেঁড়া কাগজ এবং ছেঁড়া নেকড়া ঘরের যেখানে-সেখানে ফেলিয়া রাখিও

না, একটি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখ; দিন কয়েকের মধ্যেই এত জমিয়া যাইবে যে, বদল দিয়া নূতন কাগজ পাইতে পারিবে।

আনাজের খোসা, ডাইলের ভূষি ঘরে ছড়াইয়া রাখিলে ঘর অপরিষ্কৃত দেখাইবে, তুলিয়া একটি পাত্রে জমা কর, গৃহপালিত গরু বাছুর ছাগলাদির খাদ্য হইবে।

ঘর ঝাঁইট দিয়া যে ধূলা ও আবর্জ্জনা পাওয়া যায়, তাহাও জড় করিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। অতএব পরিচ্ছন্নতা সাধনের একটি প্রধান সূত্র এই যে, ঐ প্রকার দ্রব্য-সমূহ রাখিবার পৃথক্ পৃথক্ স্থান এবং পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে এবং প্রত্যেক দ্রব্যকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিতে অভ্যাস করিবে; নিজে অভ্যাস করিবে এবং পরিজনকেও অভ্যাস করাইবে। তাহা হইলেই অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে এবং ঘরদ্বার পরিষ্কৃত দেখাইবে।

তৈজসাদি অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখা সম্পত্তি-রক্ষা এবং সম্পত্তি-বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং গৃহের তৈজসাদি যে অবস্থায় থাকিলে অকর্ম্মণ্য হয়, এমন অবস্থায় রাখিতে নাই। কোনও দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চূরিয়া কি অন্যরূপে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেই তাহাকে অবিলম্বে সারাইয়া কিংবা বদ্‌লাইয়া লওয়া উচিত। এই নিয়ম প্রতিপালনে অভ্যস্ত হইলে অনেক অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া যায় এবং গৃহও পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরই ধনক্ষয় হয়। রৌদ্র, জল, বায়ু এবং কীটাদির দ্বারা ভিন্ন

ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরন্তরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্যসকলকে এমন অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, যাহাতে ঐ প্রকার ক্ষয় যতদূর সম্ভব নিবারিত হইতে পারে। ময়লা না ধরিলে অথবা মরিচা না পড়িলে দ্রব্যসকল অনেক দিন স্থায়ী হয়। অতএব গৃহ এবং গৃহোপকরণ-সমূহ যাহাতে যথাপরিমাণে শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং ঝক্‌ঝকে থাকে, তাহার জন্য যত্ন করা অভ্যাস করিতে হয়।

গৃহবাসী জীবমাত্রকে যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থশাস্ত্র এবং শারীরশাস্ত্র—উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। এ বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। গৃহপালিত জীবগণের, আপনাদিগের সন্তানসন্ততিগণের এবং দাসদাসী প্রভৃতি পরিজনের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদায় কাজ হইল না। গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটি গূঢ় অভিমান আছে—সেটি ভাল নয়। যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মী-চরিত-জ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী ; তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

নিশীথ সময়। ভগ্ন-গৃহ-মধ্যে কুন্দ ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা!" কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন ; আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না ; অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতার শব পড়িয়াছিল, সেইখানে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। অহোরাত্র জাগরণে, এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী দিবা-রাত্র জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল ; নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্তহস্তে আপন বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল। তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশে যেন বৃহৎ চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় উজ্জ্বল চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখনও দেখে নাই। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই ; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিল ; আর দেখিল সেই

উজ্জ্বল চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ-গগন পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছে। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডল-মধ্য-মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীর স্নেহ-পরিপূর্ণ অধরে হাস্য স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণাময়ী তাহার বহুকালমৃতা জননী। আলোকময়ী সস্নেহে কুন্দকে ভূতল হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইলেন, এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে, মণ্ডলমধ্যস্থা মাতা কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা, তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানিতেছি যে, তুই বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর বয়স অতি অল্প, তোর শরীরে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন উত্তর করিল, "কোথায় যাইব ?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি দ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্রলোক দেখাইয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশে।" কুন্দ তখন যেন বহুদূর-বর্ত্তী নক্ষত্রলোকে দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অতদূর যাইতে পারিব না, আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননী মৃদুগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোকপ্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব।

যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার অমঙ্গলের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে সর্পবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"

কুন্দ দেখিল, নীলগগনপটে এক সুন্দর পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার দীর্ঘ গ্রীবা এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহাশয় হইলেও তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবৎ ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক শ্যামাঙ্গী, যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

বিলাসের ফাঁস

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্ব্বকালে অল্প ছিল, সে কথা মানিতে পারি না। তখনও লোক-সমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই—তখন খ্যাতির পথ একদিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্যদিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম্ম, পূজাপার্ব্বণ ও পূর্ত্তকার্য্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতি লাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গিয়াছে।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসা তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা নিতান্ত

অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে কর, যে ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশী হউক না, অতিথিরা যে আহার পাইতেন, তাহাতে বিলাসিতার চর্চ্চা হইত না। বিবাহাদি কর্ম্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চালচলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এই জন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার, পরিচ্ছদ, বাড়ী, গাড়ী, জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদের চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত, তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে কতদূর পর্য্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনও বদলায় নাই। এ সমাজ বহু সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্ম্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
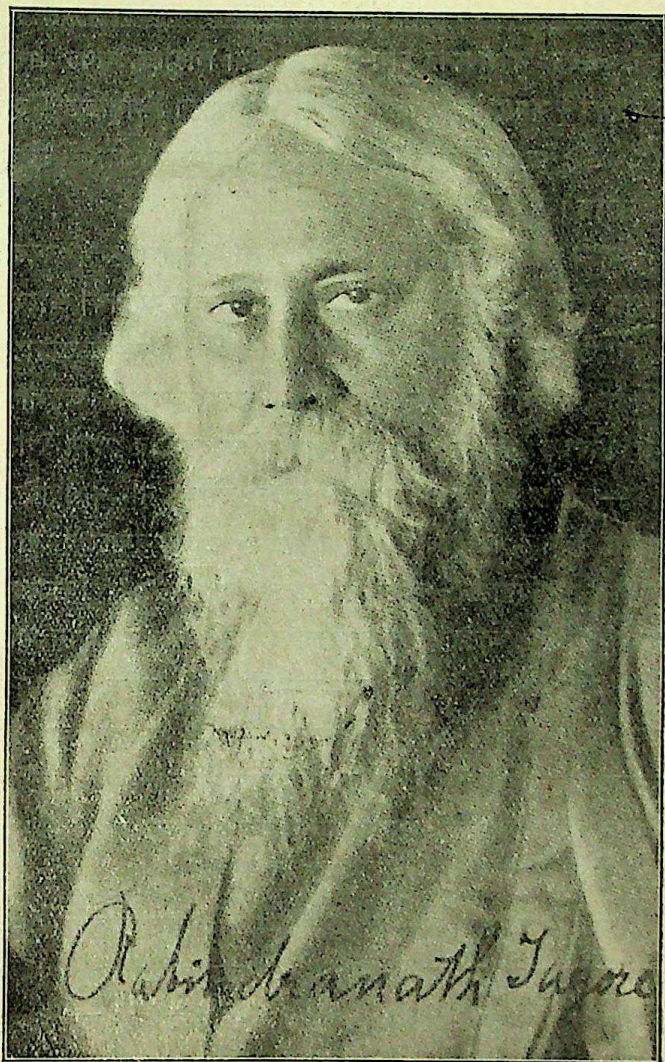
ছিল, এখন সাধারণের চাল-চলন বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় নাই, এই জন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করে; তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর, পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার আয়ের অনুপাতে, তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর না কেন? সে বলিল, তাহার কোন উপায় নাই—গ্রামের লোক ও আত্মীয় কুটুম্বগুলিকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ্ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবী সম্পূর্ণই রহিয়াছে, অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত, এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা সহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

কেহ কেহ বলিবেন, ইহা ভাল লক্ষণ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ এমনও বলিবেন, বহু সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে

এই সমাজের বহু বন্ধনপাশ শিথিল লইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। প্রাচ্য সমাজতন্ত্র কতকগুলি লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে। এই উভয় পন্থাতেই ভাল মন্দ দুইই আছে।

যেমন করিয়া হউক্, আমাদের প্রাচ্য সমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসর যে অটল আশ্রয়ে আমরা বহু ঝড় ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছি, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভরতা দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশী সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিয়া বসে যে, আমি ধনী।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায়

আমরা যে কত দিক্ হইতে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহার সীমা নাই। যদি জাতিকে রক্ষা করিতে চান তবে প্রত্যেকে জীবন-যাত্রাকে সরল করুন, সাংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব্ব করুন, তবেই লোকের গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্য্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে, ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে অর্থ সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগতভাবে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে, দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলা-দেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে দেশ বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ, নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ আকৃষ্ট হইয়া কোঠাবাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, সাজসরঞ্জাম, আহার-বিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাস ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই;—তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার

জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্ত্তিরক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্য্যের মায়া সৃজন করিতেছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত-সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্ম্ম-স্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্যই এই ছদ্মবেশী সর্ব্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

———

পদ্যাংশ

বিদায়

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দেবতা-মন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ,
জপিতেছে জপমালা বসি' নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে,
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে ;
কহিল কাতরকণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই !"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে—
"আরে আরে অপবিত্র! দূর হ'য়ে যা রে !"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমিষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কি ছল ছলিলে !"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি' দিলে !
জগতে দরিদ্র-রূপে ফিরি দয়া তরে ;
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে !"

———

ঊষা

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

অয়ি সুখময়ি ঊষে ! কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্কসিন্দূর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
জগত মোহিত করি গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যারে ?
কমল নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ ?
কার তরে ঝরিতেছে প্রেমঅশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশনমাত্র, পাইল নবজীবন !
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখিব তাঁরে
হেন সঞ্জীবনীশক্তি, যে তোমারে প্রদানিল।

পুরাতন ভৃত্য

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্ব্বোধ অতি ঘোর !
যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন "কেষ্টা বেটাই চোর।"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি, 'কেষ্টা'—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
একখানা দিলে, নিমেষ ফেলিতে, তিনখানা করে' আনে,
তিনখানা দিলে, একখানা রাখি', বাকি কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা',
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত।
তবু মায়া তা'র ত্যাগ করা ভার—বড় পুরাতন ভৃত্য !

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্ত্তি বলে, "আর পারি না কো !
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার, কেষ্টারে ল'য়ে থাকো !
না মানে শাসন, বসন বাসন, অশন আসন যত
কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত।
গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তা'র ভার,
করিলে চেষ্টা, কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর ?"

শুনে মহাবেগে ছুটে যাই রেগে, আনি তার টিকি ধরে'
বলি তা'রে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে'
দিনু তোরে!"

ধীরে চ'লে যায়, ভাবি গেল দায় ;—পর দিন উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে, রয়েছে দাঁড়ায়ে, বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি !
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত !
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তা'রে, মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি'।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—বুঝায়ে বলিনু তা'রে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—নহিলে খরচ বাড়ে !
লয়ে রসারসি করি' কসাকসি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে, বাক্স সাজায়ে, গৃহিণী কহিল কাঁদি',—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে!"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম! নিবারণ
সাথে যাবে।"

রেলগাড়ি ধায় ;—হেরিলাম, হায়! নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত, অতি প্রশান্ত, তামাক সাজিয়া আনে !
স্পর্দ্ধা তাহার হেন মতে আর কত বা সহিব নিত্য।
যত তা'রে দুষি, তবু হ'নু খুসি, হেরি পুরাতন ভৃত্য।
নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে পিছনে সম্মুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমিষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।

জন-ছয়-সাতে মিলি' এক সাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হ'ল আশা, আরামে দিবস যাবে !
কোথা ব্রজবালা ! কোথা বনমালা ! কোথা বনমালী হরি !
কোথা হা হন্ত ! চির বসন্ত ! আমি বসন্তে মরি ।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—কেষ্টা আয় রে কাছে ।
এতদিনে শেষে, আসিয়া বিদেশে, প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে !
হেরি তা'র মুখ ভরে' উঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত !
নিশিদিন ধ'রে, দাঁড়ায়ে শিয়রে, মোর পুরাতন ভৃত্য ।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তা'র ভাত ।
বলে বার বার, "কর্ত্তা তোমার কোন ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন ।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম ; তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল ব্যাধিভার আপনার দেহ'পরে !
হ'য়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু'দিন বন্ধ হইল নাড়ি !
এতবার তা'রে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি !
বহুদিন পরে, আপনার ঘরে, ফিরিনু সারিয়া তীর্থ,
আজ সাথে নেই, চিরসাথী সেই, মোর পুরাতন ভৃত্য !

বঙ্গভাষা

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে—অবোধ আমি !—অবহেলা করি'
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি' ।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল-তপে অবরেণ্যে বরি !
খেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন ।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'হে দিলা পরে—
"ওরে বাছা ! জননী-ভাণ্ডারে রত্নরাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে ।

বাংলা দেশ

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোণার ফসল—
সোণার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল, শ্যামা—
ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !
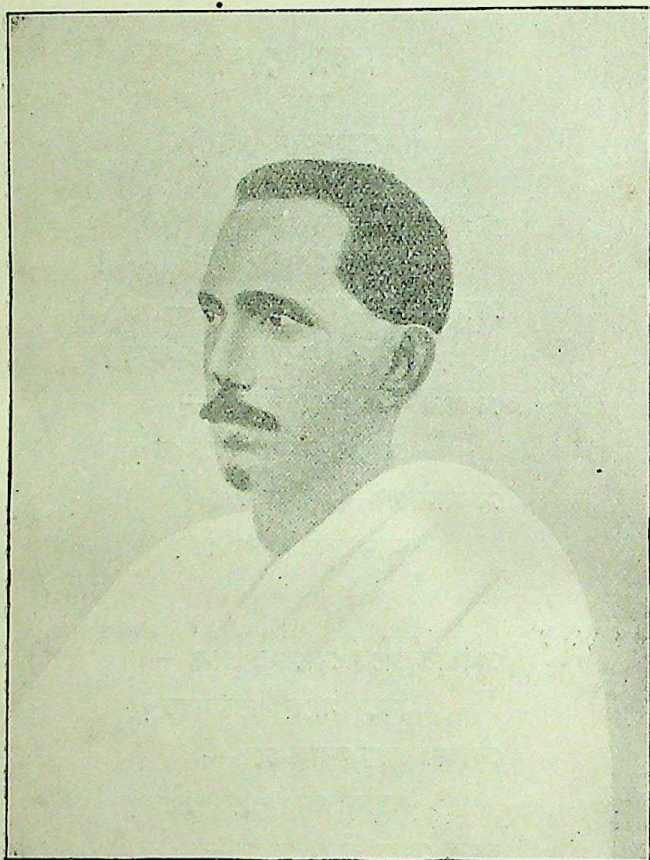
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের, রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

———

স্বর্গ ও নরক

(সেখ্ ফজ্‌লল্ করিম)

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক ? কে বলে তা' বহুদূর ?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক,—মানুষেতেই সুরাসুর !
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য-বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

(কাশীরাম দাস)

দ্বিজসভা-মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ-মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে ॥

যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা পাবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয়, চিত্তে হইলা অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
"কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ?
সভা হ'তে উঠি যাহ, কোন্ প্রয়োজন?"
অর্জ্জন বলেন, "যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥"
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
"কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে?
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্র সবে, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥

সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে ?”
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে কহিল ঃ—
“কি কারণ দ্বিজগণ কর নিবারণ ?
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন ॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন ?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা-সবার কি কাজ ?”
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকট যান ধনঞ্জয় তবে ॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥
“সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক ॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিংবা, করি অনুমান ॥
কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব, নহে কি যাবে আমার ॥

নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥"
কেহ বলে, "ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত॥
এই ক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥
তবে পার্থ প্রণময়ে ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন, চাহি দ্বিজগণে :—
"লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি॥"

শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
"লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হোক দ্রুপদনন্দিনী॥"
ধনু ল'য়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্র বিন্ধিবেক যেই জন,
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
বিন্ধিল, বিন্ধিল, বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্ময় মানি সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল,—"রহ রহ, যাজ্ঞসেনি॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি?

মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ?
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চক্রোশ উর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয়॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য, কেমনে বিন্ধিল ?"
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে, কেহ বলে নয়।
"ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ?
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।"
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হইল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন :—
"অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে ?
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥"
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ?

সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে, বিন্ধিব ততবার॥"
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥

সুখ

(কামিনী রায়)

নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয়?

কামিনী রায়

কাঁদিতেই শুধু বিশ্ব-রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন ক'রে ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী 'পরে ?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে—
না—না—না—মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদা'তে নরে।

কার্য্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর অঙ্গন সংসার এই ;
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর ;
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

'বিষাদ' 'বিষাদ' 'বিষাদ' বলিয়া
কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়ে পড়ে ?

সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ ভার ?

আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে ;
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

মেঘনাদ ও বিভীষণ

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কহিল বাসবজেতা,—(অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্ত লৌহাকৃতি
রোষে !) "ক্ষত্র-কুল-গ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ ! নির্লজ্জ তুই ক্ষত্রিয়-সমাজে ;

রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ। তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল, দুর্ম্মতি?”
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম-প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জন-বলে,
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা। ধরিল সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ,—নারিলা তুলিতে
তাহায়। কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা, রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনু! সাপটিলা কোপে
ফলক, বিফল বল সে কাজ-সাধনে।
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে, বৃথা টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র। মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে?
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে।
"এতক্ষণে" অরিন্দম কহিলা বিষাদে ;—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে। হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ? শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ ? ভ্রাতৃপুত্র বাসব-বিজয়ী ?
নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি ; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ ?" উত্তরিল কাতরে রাবণি,—
"হে পিতৃব্য! তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি ? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে।

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ? হে রক্ষোরথি ! ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু ! পঙ্কিল-সলিলে,
শৈবাল-দলের ধাম ? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীর-কেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, একি মহারথি-প্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে শুনি না হাসিবে
এ কথা। ছাড়হ পথ, আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ! পরাক্রম দাসের। কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল

দম্ভী ; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত! পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য! প্রফুল্ল-কমলে
কীটবাস! কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃপুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"

হতভাগ্যের আক্ষেপ

(চণ্ডীদাস)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে দহিয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
হায়! কি মোর কপালে লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি।

উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসানু, সাগর বাঁধিনু,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
আপন করম দোষে।

——

বাঙ্গালা ভাষা

(অতুলপ্রসাদ সেন)

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাঙ্গালা ভাষা !
তোমার কোলে,
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা !

কি যাদু বাঙ্গালা গানে !
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে !
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।

ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা
আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা
এমন দুঃখ-শ্রান্তিনাশা ।

বিদ্যাপতি, চণ্ডি, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
ঐ ফুলেরই মধুর রসে
বাঁধ্‌লো সুখে মধুর বাসা !

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে,
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে !
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা ।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাক্‌নু মায়ে 'মা, মা' বলে ;
ঐ ভাষাতেই বল্‌ব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা !

দধীচির আত্ম-দান

(হেমচন্দ্র বন্দোপ্যাধ্যায়)

নগেন্দ্র-অঞ্চলে যথা নগেন্দ্র-সম্ভবা
তটিনী অলক-নন্দা কল কল স্বরে
বহিছে, অটবী-অঙ্গ, ধীরে প্রক্ষালিয়া,
দিনমণি অস্তগত, উড়িলা সুরেশ
ছাড়িয়া অম্বর-পথ ! উঠি তপোধন
সশিষ্য সম্ভ্রমে, সুখে অতিথি সম্ভাষি'
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন ;
জিজ্ঞাসিলা সুমধুর গম্ভীর বচনে,—
"আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ ?"
ভগ্নচিত্ত দেবরাজ নেহারি' নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ, নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ !
হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ্‌গদস্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—
"পুরন্দর, শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক, আজি পবিত্র আশ্রম !
এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে, অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !

হা দেব! এ ভাগ্য মম স্বপ্নেরো অতীত!"
কৃপালু ধীমান্ পুনঃ ললিত দৃষ্টিতে
চাহি শিষ্যকুলমুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রু-ধারা মুছায়ে সবার,
সুধা-পূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে "কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি! হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভব-মণ্ডলে
পর-হিতে প্রাণ দিতে পায় কয়জন?
হিত-ব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে, অবোধ প্রাণী,—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পর-হিতে, কিসে নিয়োজিবে?
লভি জন্ম নর-কুলে কি ফল হে তবে?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্য-মণ্ডলি,
জগত-কল্যাণ-হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম-পালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতী-তলে।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশীষিলা শিষ্যগণে; কহিলা বাসবে,—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি, দেহ মম বারেক পরশি'।"
অগ্রসরি' শচীপতি সহস্র-লোচন,
তপোধনশিরঃ স্পর্শি সুকর-কমলে,

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কহিলা আকুল-স্বরে,—"এ জগতী-তলে
সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক !
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ মহীমণ্ডলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর !
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ সাধন অনুদিন !
পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম
তুমিই বুঝিয়াছিলে—উদ্‌যাপিলে আজ।
কি বর অর্পিব তোমা, নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর ; এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে !
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন—
করিবে জগত খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে।"
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চে হরি-সংকীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে !
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাস-শূন্য, নিস্পন্দ ধমনী
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ, ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি'

নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরি-শঙ্খ ; শূন্য দেশ যুড়ি'
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি' !
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

অন্নদার আত্ম-পরিচয়

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে।
"পার কর" বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরী পাটনী।
"একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
"বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥"
পাটনী বলিছে, "মাগো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল ;"
দেবী কন, "দিব আগে পারে লয়ে চল।"
বসিয়া নায়ের ধারে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।

পাটনী বলিছে, "মাগো বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে।"
ভবানী কহেন, "তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল্‌।"
পাটনী বলিছে, "মাগো শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও-রাঙ্গা চরণ।"
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে।
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।
সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়,
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী,
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল,
"দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল।
হের দেবি! সেঁউতিতে রেখেছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ!
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥

তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হ'তে মোরে দেহ পরিচয়॥"
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
"কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে॥"

খদিজা বিবি

(সৈয়দ্ এমদাদ্ আলি)

ঘন ঘোর অন্ধকারে আরব-গগন
যবে সমাচ্ছন্ন, দেবী, আরব-সন্তান
কু-আচার, ব্যভিচারে ঘোর নিমগন,
সে সময়ে যে বীরেন্দ্র, মানব-প্রধান,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ করি বিতরণ
নাশিল তিমিররাশি সকলের আগে,
—চিনিলে তাঁহারে তুমি। করিয়া যতন
শত ভালবাসা দিয়া শত অনুরাগে

বরিলে সে বর বপু, একাগ্র অন্তরে
স্থাপিলে বিশ্বাস, দেবি, ইস্লাম উপরে।
কত যুগ মিলাইল কালের প্রবাহে,
তবু দেবি, তব কথা মোস্লেমের গেহে
ভক্তিভরে নবোৎসাহে হয় উচ্চারিত
প্রতিদিন, শত শত ভক্ত রসনায়।
তোমার কাহিনী গায়, করি বিমোহিত
প্রতি মোস্লেমের প্রাণ। প্রত্যেক হিয়ায়
যাচে বর—কন্যা জায়া হউক তাহার
তব মত পতিপ্রাণা, সতীত্ব-আধার,
তব মত ধর্ম্মে তারা হো'ক স্থির অতি ;
তব মত প্রতিকর্ম্মে ধর্ম্মে থাক্ মতি।
তোমারি মতন তারা পতিসহ থাকি,
প্রকৃত কর্ম্মের পথে নিক্ তাঁরে ডাকি।

ডেভিড্ হেয়ার

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে ;

জনমি খৃষ্টান-কুলে খৃষ্ট-নামে তরাতে ত্বরিতে
চাহ নাই ; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত।
অর্থদানে মুক্তপাণি, বিদ্যাদানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্তদানে ; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত !
কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি !—ও অস্থি নেবে না গোরস্থান !
তাই ছাত্রপল্লীতলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা !
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু !
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত—হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু !

সীতা ও সরমা

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কহিলা সরমা, "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ংবর-কথা তব সুধামুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি !

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে !
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর ? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে !"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া :—
"ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে—
বাঁধি নীড় থাকে সুখে, ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি,
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, দেখ ভাবি মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি, মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু, কিন্তু জীবনাশে

সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে।
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি! কিন্তু এ কাননে
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি।
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি!
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি? শিখিসহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে?
অতিথি আসিত নিত্য করভ করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম,—স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবর-শিরে,
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।

সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতনসম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাসি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব—নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে !
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে ।

বুদ্ধের উপদেশ

(নবীনচন্দ্র সেন)

এক দিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে
আছেন সশিষ্যে বসি' পবিত্র বিহারে ।
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণা গৌতমী জননী
আসি' শোকাতুরা কহে,—“নর-নারায়ণ,

অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার !
বৈজয়ন্তসম পুঁরী হউক চূর্ণিত !
দেহ বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম। একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা ! দয়াময় তুমি
কর দয়া এ দাসীরে ! আছে মা তোমার !
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর ?
দেহ এই ক্ষুদ্র প্রাণ ! দেহ দুই প্রাণ !
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর !"
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে
কি গভীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে,—
"হায় মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে ! সহে জন্ম-জন্মান্তরে !"
কহিলেন,—"মাতঃ ! জানি ঔষধ ইহার ;
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ।"
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
শুষ্কহৃদে প্রবাহের হইল সঞ্চার।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি-ধূসরিত,
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দ-বিবশা।
কহিলেন বুদ্ধদেব,—"উঠ, মাতঃ ! যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল !"
সামান্য সরিষা ! হায় ! দ্বিগুণ অধীর
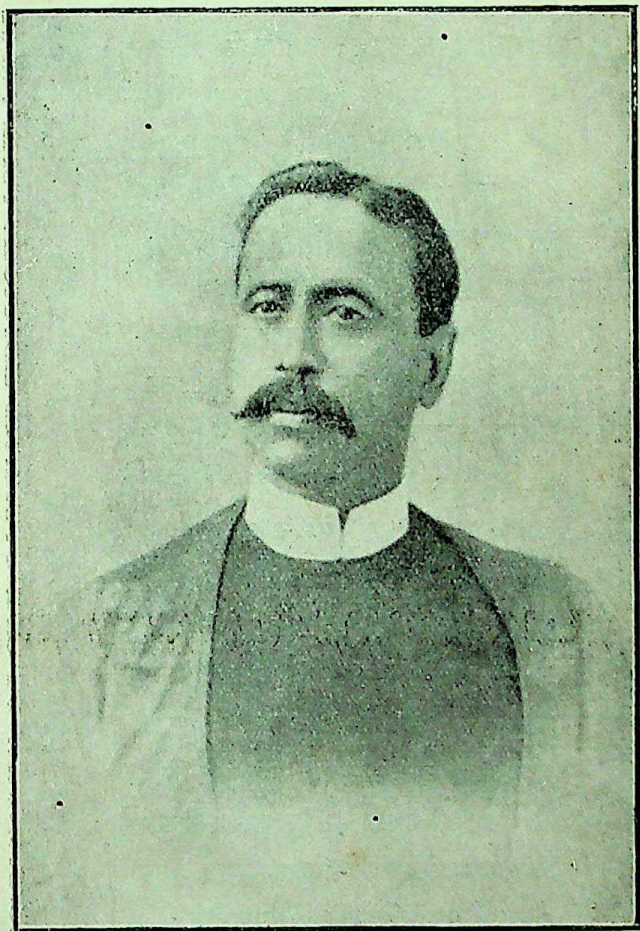
নবীনচন্দ্র সেন

হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণা গৌতমীর।
চলিল সে রুদ্ধশ্বাসে; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ, মাতঃ! মরেনি কখন।"
মৃতপুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিলা সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায়! মিলিল না গৃহ
যেই খানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী,
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাসপ্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগৎ
নিশীথিনী-ছায়া-মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে! কত পুত্র-চিতা
জ্বলি'ছে মানব-বক্ষে—শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত!
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর;
নিবিল সে দীপালোক। মৃতপুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আছে বসি পূর্ণ আত্মহারা।

দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে,—
"দেখ, মাতঃ! হায়! ওই দীপালোক মত
মানব-জীবনালোক জ্বলি অনুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম্মচক্র কর অনুসার।"

কৃত্তিবাস

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে,
কীর্ত্তিবাস নাম তোমা।—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গভবনে;
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি!
নয়ন-রঞ্জন রূপ কুসুম-যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে। আপনি ভারতী,
বুঝি ক'য়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব, স্মরি, হে ভকতি!

পবন-নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার-বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী,
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গমণ্ডলে,
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

ভারতের শিক্ষা

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার,
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী, আত্মবন্ধু, অতিথি, অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,

নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

ভারতবর্ষ

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।
ভগবদ্‌গীতা গাহিলা স্বয়ং
ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর,
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।

সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাঁদের মধ্যে তরুণ তাপস,
প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
আর্য্য-ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র !
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে,
চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
যাদের গরিমাময় এ অতীত,
তাঁরা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হউক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি ? যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব।
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাঁদের মহিমাময় এ অতীত,
তাঁদের কখন হ'বে না ধ্বংস।
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা-আদর্শ,
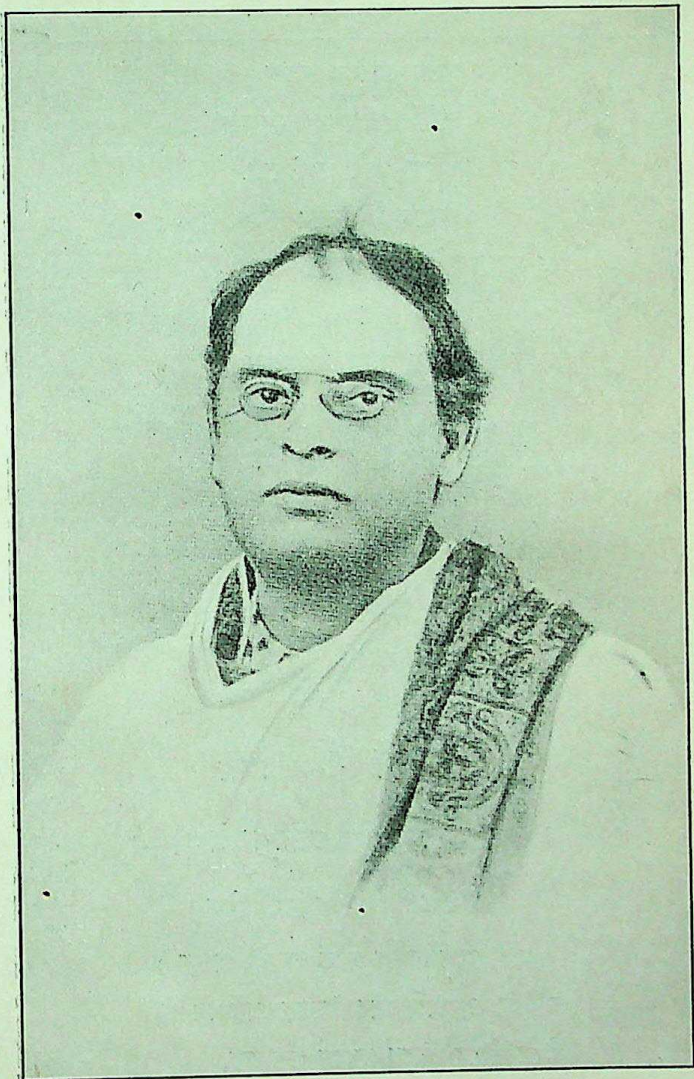
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জাগা'ব নূতন ভাবের রাজ্য
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !
এ দেব-ভূমির প্রতি তৃণ'পরে,
আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি ;
এ মহাজাতির মাথার উপরে
করে দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি !
ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে তুমি মা কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী !

নদী ও কাল

(যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

নদী আর কাল-গতি একই প্রমাণ ;
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব-গমনে গত হয়,
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।

উভয়েই গত হ'লে আর নাহি ফেরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।
সর্ব্ব অংশে একরূপ যদিও উভয়,
চিন্তা-রত চিত্তে এক ভেদ জ্ঞান হয়—
বিফলে না বহে নদী ; যথা নদী ভরা,
নানা শস্য-শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল, সদাত্ম-ক্ষেত্রের শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

শুষ্ক তরু

(রাজকৃষ্ণ রায়)

হায়, তরু ! কেন তব হেন কলেবর ?
কে হরিয়ে নিল, বল, হরিত বরণ
চারু পত্রচয়ে ? মরি, অতি মনোহর !
যাহে ভাবুকের ভাব করিত হরণ।

কোথা তব মধুমাখা রসভরা ফল,
মানব-রসনা যাহে করিত বাসনা ?
যে রস করিত পান বিহঙ্গমদল
শাখে বসি' যশঃ কত করিত ঘোষণা ?

যখন নিদাঘকালে তেজোময় ভানু
তাপিত করিত খর করে পান্থকুলে ;
হায় রে, তখন তা'রা জুড়াইতে তনু,
লইত আশ্রয় আসি, তোমার এ মূলে।

কেহ বা ছায়ায় তব করিত শয়ন,
বিছা'য়ে শ্যামল বস্ত্র দূর্ব্বাদল 'পরে ;
অনিল-সহায়ে শাখা-পাখা-সঞ্চালন
করিতে তাহারে তুমি হরিষ অন্তরে।

কোথা সেই অকৃতজ্ঞ পান্থ, পক্ষিগণ,
তুষিত আদরে যা'রা লাভের আশায় ?
কালেতে তোমার নাই সে কাল এখন,
ভ্রমেও বারেক নাহি নিরখে তোমায়।

এখন এ দশা তব নিরখি' নয়নে,
"সময়ে সকলে বন্ধু"—জানিয়াছি সার।
অসময় হ'লে কেহ নাহি ভাবে মনে,
অপাঙ্গেও ফিরে নাহি চাহে একবার।

যক্ষের আলয়

(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কুবের-আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায় ;
সম্মুখে বাহির-দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে,
শোভে তাহে নলিনীর হাট।
উহাতে একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
রমণীয় মণিময় ঘাট !
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে,
ভ্রমে হংস হংসী অবিশ্রামে।
যাইতে মানস-সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উদ্যানে একটি চারু, শিশু পারিজাত-তরু,
বায়ু-কোলে হেলে পুষ্প হাসে ;
বহুযত্নে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুতসম তেঁই ভালবাসে।
উচা ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে ;

সুবর্ণ-কদলী যত, চারিধারে শোভে কত,
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে !
মাধবী-মণ্ডপ 'পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার
সোণার একটি আছে দাঁড়—
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রুণু রুণু বাজে তায় বালা ;
স্মরিলে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে ;
এবে উহা শূন্য-প্রায় কমল না শোভা পায়,
কখনও দিবা-অবসানে।

———

সাধু নাসিরউদ্দিন

(অজ্ঞাত কবি)

চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার-মাঝে
বসিয়া নাসিরউদ্দিন জ্ঞানের সাধক-সাজে।
কি আনন্দে মগ্ন যোগী! কঠোর সে সাধনায়,
স্বরগের সুধা-ধারা হৃদিমাঝে ব'য়ে যায়।
আনন্দে উঠিছে ফুটি, পবিত্র উজল হাসি ;—
কোরাণ-নকলে রত ; চারিদিকে গ্রন্থরাশি।
সহসা চাহিয়া মুখ কঙ্কণের ঝণৎকারে
দেখেন পাঠানরাজ বেগম দাঁড়ায়ে দূরে।
ফুল্ল পারিজাত সম হাসি হাসি মুখখানি,—
কে যেন দিয়েছে তায় বিষাদ কালিমা টানি'।
পড়িতেছে গণ্ড বহি' দর বিগলিত ধারা,
নত মুখে, মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা।
অতি সন্তর্পণে রাখি ক্রোড় হ'তে বহিখানি
চলিলা সম্রাট্ ত্বরা, যথা ছিল মহারাণী ;
যতনে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমল স্বরে
বলিলেন, "মহারাণি, কি হয়েছে বল মোরে।"
স্বামীর কথায় অশ্রু আরো দ্রুত ধারে বয়,
ভাবাবেগে মহারাণী নিশ্চল নির্ব্বাক্ রয়।

বহুক্ষণ পরে শেষে বলিতে লাগিল ধীরে,
"জাঁহাপনা ! শৈষ বাঁদী ছিল যে আমার তরে,
তোমার আদেশে আজি বিদায় দিয়াছি তায়,
সেঁকিতেছিলাম রুটি দেখ হাত জ্বলে যায়।
নষ্ট হ'য়ে গেছে রুটি, কাঁদিতেছিলাম তাই ;
তোমার আহার তরে আর কিছু ঘরে নাই।
বিশাল এ ভারতের সম্রাট্ আমার স্বামী,
একটি বাঁদীও কিগো পেতে নাহি পারি আমি ?
পুড়েছে আমার হাত, তুমি রবে অনাহারে,
অগণিত ধনরত্ন রাজ-কোষে কার তরে ?"

থামিলেন মহারাণী, সম্রাট্ বলিল ধীরে,
"মহারাণি ! কাঁদিতেছ শুধু তুমি এরি তরে ?
হাত পুড়িয়াছে তব, মোর হাত আছে ঠিক,
এর জন্য এত কাঁদা ! ছিছি মহারাণি ! ধিক্ !
তুমি যদি নাহি পার করিবারে গৃহ-কাজ,
নিজ হস্তে লব তাহা, আমিই করিব আজ।
আমি ভেবেছিনু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উড়িষ্যায়,
দারুণ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে বহু লোক মারা যায় ;
তারি জন্য বুঝি তুমি কাঁদিতেছ গৃহ-কোণে,
প্রজাদের শোক বুঝি বিষম বেজেছে প্রাণে।
মহারাণি ! এই দুঃখে এ ভাবে কাঁদিতে আছে ?
ভাব দেখি, তোমা চেয়ে কত দুঃখী দেশ মাঝে—

সদা নিদারুণ দুঃখে করিতেছে হাহাকার !
তুমি কাঁদিতেছ ভাবি' এক বেলা অনাহার ?
অগণিত ধনরত্ন রাজার ভাণ্ডারে আছে ;
আমার ভাণ্ডার নয়, তার পানে চাওয়া মিছে।
আমি ত প্রহরী মাত্র, নাহি মোর অধিকার,
সে ধনের কণামাত্র করিবারে ব্যবহার।
প্রত্যহ কোরাণ লিখি করি যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতেই দু'জনার চলে গ্রাস-আচ্ছাদন।
পরধনে লোভ করা সে কি ভাল, মহারাণি ?
তোমার সে ভাব নয়, আমি তাহা ভাল জানি।
নিরুৎসাহ না হইও, মনে রেখো দিনমান
মাথার উপরে থাকি দেখিছেন ভগবান্।"

সাগর-তর্পণ

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

বীরসিংহের সিংহ-শিশু ! বিদ্যাসাগর, বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার।

নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
কর্‌লে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ,
অভাজনে অন্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি কর্‌লে কতবার।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূর্‌ল নাকো হায় !
বিশ বছরে পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাইত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর।
কীর্ত্তি-ঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের পর।

স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরত নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত, একটি তেমন লোক
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত ! যে জন ভুলিয়ে দিবে শোক।

রিক্ত কর্‌বে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ
রাত্রে স্বপন, চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে' লক্ষ্য রেখে' স্থির
তোমার মত ধন্য হবে চাই সে এমন বীর।

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজ্‌বো তবে হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ঐ পায়,
সে যে চটি, উচ্চে যাহা উঠ্‌ত একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।

সেই যে চটি, দেশী চটি বুটের বাড়া ধন
খুঁজ্‌ব তাকে, আন্‌ব তাকে, এই আমাদের পণ।
সোনার পিড়েয় রাখ্‌ব তারে থাক্‌বো প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দীগাঁয়।

রাখ্‌ব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতে'র 'পর
নজর কারো লাগ্‌বে নাকো অটুট হবে ঘর
উঁচিয়ে মোরা রাখ্‌ব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত--অমর্য্যাদায় যার।

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু বিজয় নাম
ঐ নামে হায় ! লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর বীর !
বীরসিংহের সিংহ-শিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

পরিশিষ্ট

গদ্যাংশ

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে তিনিই সর্ব্বাগ্রে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার মানসে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। সংসার-ত্যাগের পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত এবং ভারতবাসিগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন। এই মহাপুরুষের ধর্ম্মব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া মিস্ মার্গারেট নোবল্ (ভগিনী নিবেদিতা) তাঁহার শিষ্যা হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয় দয়াপূর্ণ ছিল—দুর্ভিক্ষপীড়িত, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আজ পর্য্যন্তও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় ছাত্রমাত্রেরই এই বীর সন্ন্যাসীর ইংরাজি ও বঙ্গভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি ভক্তিসহকারে পাঠ করা উচিত। ইংরাজি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৪১ বৎসর মাত্র।

তাঁহার রচিত 'কর্ম্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'চিকাগো-বক্তৃতা' প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গভাষার অলঙ্কার-স্বরূপ।

বিবেকানন্দ লিখিত 'মহাপ্রস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত যোগীন্দ্রনাথ বসু বিরচিত 'মহাপ্রস্থান' নামক কবিতা পাঠ করিলে পাঠক মাত্রেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

রামপ্রাণ গুপ্ত

১২৭৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেদারপুর নামক গ্রামে রামপ্রাণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত সাহিত্য ও ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ বহু মাসিক পত্র অলঙ্কৃত করিত। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধাবলী গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি 'হজরতের জীবনী', 'পাঠান-ইতিবৃত্ত', 'মোগল-বংশ' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া পণ্ডিত-সমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'প্রাচীন ভারত' তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। ছাত্র মাত্রেরই হজরত মোহাম্মদের জীবনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। এই মহাপুরুষের গুণাবলী পাঠ করিলে মানব-হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি রিপণ কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রাচ্য-দর্শন ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। বিজ্ঞান-বিষয়ক কঠিন তথ্য-সমূহ তিনি অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালীন

মাসিক পত্রিকার পাঠকবর্গ তাঁহার প্রবন্ধসমূহ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। তিনি সাহিত্য পরিষদের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

'প্রকৃতি', 'কর্ম্মকথা', 'জিজ্ঞাসা', 'মায়াপুরী' ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

শিবনাথ শাস্ত্রী

শিবনাথ চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী চাংড়িপোতা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত এম্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু ও তেজস্বী ব্যক্তি জগতে অতি বিরল। তাঁহার প্রবন্ধাদি সরল অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষায় লিখিত। 'মেজ বৌ', 'নয়ন তারা', 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় প্রতিভা-বলে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আট বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায়

আসেন। কয়েক বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠেন ও ২২ বৎসর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গগদ্যসাহিত্যের অবস্থা শোচনীয় ছিল। তিনি বঙ্গভাষাকে উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিক্ষাবিস্তার কার্য্য, সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগমীকরণ, সমাজসংস্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। তাঁহার ন্যায় নির্ভীকচেতা পুরুষ আমাদের সমাজে অতি বিরল।

ঈশ্বরচন্দ্র যে শুধু বিদ্যারই সাগর ছিলেন তাহা নহে, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। তিনি এরূপ মুক্তহস্তে দান করিতেন যে তাঁহাকে 'কলির বলি' এই আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানাবিষয়ে ও নানাপ্রকারে বিদ্যাসাগর তাঁহার দেশের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের তিরোভাব হয়।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের উপযোগী বহুপুস্তক তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'আখ্যান-মঞ্জরী' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর যে বৎসর বি. এ. পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথম গৃহীত হয় বঙ্কিমচন্দ্র সেই বারেই বি. এ. উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে

নিযুক্ত হন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই.' উপাধি প্রদান করেন।

প্রথম-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যশিষ্য ছিলেন। গুপ্ত-কবির দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সম্পাদিত সংবাদ-প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই স্বরচিত কবিতাবলী প্রেরণ করিতেন।

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের রচনা অধিকাংশই সংস্কৃত-শব্দ-বহুল। সে কালের লেখক ও পাঠকেরা দীর্ঘ-সমাসবদ্ধ পদের অত্যন্ত পক্ষপাতী ও অনুপ্রাসের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষার দেহ হইতে সংস্কৃতরূপ "নিগড়ের বন্ধন শিথিল করেন" এবং অনুপ্রাসের অত্যাচার হইতে ইহাকে রক্ষা করেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহ বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তাঁহার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনাবলীও অননুকরণীয়। তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে তল্লিখিত যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হইত তদ্দ্বারা তিনি বঙ্গবাসীকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী বহু লেখক সাহিত্য-সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন।

তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সরকারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'আনন্দমঠ', 'কপালকুণ্ডলা', 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি তাঁহার লেখনীপ্রসূত।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

'শ্মশান' শীর্ষক প্রবন্ধ চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' হইতে উদ্ধৃত। বঙ্গভাষায়—এবং সম্ভবতঃ কোনও ভাষায়—এরূপ প্রাণস্পর্শী রচনা আর আছে কিনা সন্দেহ।

ইনি বহরমপুরের অধিবাসী ছিলেন। শেষজীবনে তিনি বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠদাতা কাশিমবাজারের মহারাজার বৃত্তিভোগ করিতেন।

ইনি 'উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদকতা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' ইনি প্রবন্ধ লিখিতেন ও গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিখ্যাত দত্তবংশে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত ইংলণ্ডে গিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি ডিভিসনল্ কমিশনর হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিলাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শেষজীবনে তিনি বরোদা রাজ্যের দেওয়ানের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের ন্যায় রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার সেবা করিতেন। 'মাধবীকঙ্কণ', 'জীবন-প্রভাত', 'জীবন-সন্ধ্যা' নামক তাঁহার উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে।

তিনি ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ সর্ব্বজনসমাদৃত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহার সিভিলিয়ান জামাতা স্বনামধন্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রমেশ-বাবুর একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন। ইহা ইংরাজীভাষায় লিখিত।

পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'বঙ্গের রত্নমালা' যথার্থই বঙ্গভাষার মহামূল্য আভরণস্বরূপ।

বঙ্গসমাজের শীর্ষস্থানীয় বহুলোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণশক্তিদ্বারা তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের জীবনের ঘটনাবলী হইতে অমূল্য নীতিনিচয় আহরণ করিয়াছেন। কুটীরবাসী দরিদ্র অথবা পথিপার্শ্বস্থ ভিক্ষুকের চরিত্রেও সমাজের অনুকরণযোগ্য গুণাবলী দৃষ্ট হইলে তাহা তিনি সাদরে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তিনি জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। আজীবন প্রাণপণ চেষ্টাদ্বারা তিনি বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বৃক্ষলতাদিরও সাড় বা অনুভূতি আছে তাহা তাঁহার আবিষ্কৃত সূক্ষ্মযন্ত্রাদিদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। বসু-বিজ্ঞানমন্দির ইঁহার প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গসাহিত্য ইঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ প্রাঞ্জল্ ভাষায় লিখিত।

গভর্ণমেণ্ট ইহাকে স্যার উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাঁঠাল-পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে অস্থায়ী ডেপুটী কলেক্টর, পরে

স্পেশাল সাবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার রচিত 'জাল প্রতাপচাঁদ' ও 'পালামৌ' নামক গ্রন্থদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৫১ সালে গুরুদাসের জন্ম হয়। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া এম্. এ., ডি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রায় সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তি ছিল অতুলনীয় এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে জননীর আশীর্ব্বাদই তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে কৃতিত্ব প্রদান করিয়াছে। তিনি উকীল হইতে হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই পদ প্রাপ্ত হন নাই। প্রতীচ্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মধ্যে তাঁহার ন্যায় হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠা ও সরলতাপূর্ণ সৌজন্য অতি বিরল। তিনি গণিত শাস্ত্রে ও সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৩২৫ সালে এই মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার পুস্তকনিচয়ের মধ্যে 'A Few Thoughts on Education' এবং 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভূদেবচন্দ্রের জন্ম হয়। কয়েক বৎসর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করার পর তিনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। মাইকেল মধুসূদন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পাঠ-সমাপনান্তর ভূদেবচন্দ্র

শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত করেন। অবশেষে তিনি কিছুকালের জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। 'আচার প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থত্রয় তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বঙ্গীয় যুবকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মের ও জাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত পুস্তকসমূহ বিরচিত। সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বাসনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য জীবনের বহু সঞ্চিত অর্থ তিনি অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার প্রবন্ধাদির ভাষা সরল ও আড়ম্বরহীন। তিনি যখন প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন তখন তিনি ছাত্রদের জন্য বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মোজাম্মেল হক্

ইনি বঙ্গমাতার সুসন্তান, কারণ ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ যোগ্যতার সহিত বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। গদ্য ও পদ্য রচনায় এবং মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'হজরতের জীবনী', 'ফেরদৌসী-চরিত্র', 'মহর্ষি মনসুর' প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য-গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

তিনি সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ভারতবিখ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের পিতা। লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁহাদিগের

চিরদিনের মনোমালিন্য বিস্মৃত হইয়া ঠাকুর মহোদয়দিগের গৃহে একত্র মিলিত হইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "নোবেল প্রাইজ" প্রাপ্ত হন।

ক্ষুদ্রগল্প বা উপন্যাস লিখনে, গীতিকাব্য বা প্রবন্ধ রচনায়, রাজনীতি বা সমাজনীতি-বিষয়ক গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসামান্য। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশ বহুবার ভ্রমণ করিয়াছেন। বঙ্গভাষা বা বঙ্গবাসী নগণ্য ভাষা বা নগণ্য জাতি নহে ইহা তাঁহার প্রতিভাদ্বারা জগতের নিকট প্রমাণিত হইয়াছে।

তাঁহার রচিত 'গীতাঞ্জলি', 'চয়নিকা', 'কথা ও কাহিনী', 'রাজর্ষি', 'গল্পগুচ্ছ' ইত্যাদি গ্রন্থ বঙ্গভাষার মহামূল্য আভরণ-স্বরূপ।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে খুলনা জেলায় সেনহাটি গ্রামে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 'সদ্ভাবশতক' লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি তিনখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার সাগড়দাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং

ইউরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর মাদ্রাজে ছিলেন। তথায় ইংরেজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। বিলাতে ঋণভারে জড়িত হইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁহাকে অর্থ প্রেরণ করিয়া মহাসঙ্কট হইতে ত্রাণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতেন।

শেষ জীবনে তিনি অর্থাভাবে বহু ক্লেশ পাইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মধুসূদন বঙ্গভাষায় চতুর্দ্দশ-পদী কবিতা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব-কাব্য' তাঁহারই বিরচিত। তিনি বহুভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। 'ক্যাপ্‌টিভ্‌ লেডী' তাঁহার রচিত ইংরেজী কাব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তিনি সেকালের বঙ্গবিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই যশস্বী হইয়াছিলেন এবং বঙ্গভাষায় নানারূপ নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন।

'কুহু ও কেকা', 'তীর্থ-সলিল', 'বেণু ও বীণা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথ বিরচিত।

সেখ ফজলল্ করিম

বর্ত্তমান যুগে যে সকল মুসলমান কবি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপরতা দেখাইয়াছেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার ভাষা সরল, কিন্তু ভাব অতি উচ্চ। 'স্বর্গ ও নরক' শীর্ষক ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে।

কাশীরাম দাস

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কাশীরাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বঙ্গভাষায় লিখিত মহাভারত তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির এই গ্রন্থ অতুলনীয় সম্পদ্।

কামিনী রায়

ইনি প্রসিদ্ধ লেখক ৺চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও সেসনজজ ৺কেদারনাথ রায়ের স্ত্রী। ইঁহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আলো ও ছায়া' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'নির্ম্মাল্য', 'গুঞ্জন' প্রভৃতি তাঁহারই লেখনী-প্রসূত।

মহিলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে তিনি অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস

অমর কবি চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বীরভূমের নান্নুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের লোক এবং বিদ্যাপতির সমসাময়িক। ইঁহার ভক্তিরসাত্মক কবিতা বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পদ্। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদি বৈষ্ণব কবি।

অতুলপ্রসাদ সেন

গান রচনায় সিদ্ধহস্ত অতুলপ্রসাদ সেন প্রথম জীবনে রঙ্গপুরে ব্যারিষ্টারী করিতেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে অবস্থিতি করেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীতসমূহ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে। তিনি সম্প্রতি (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারী উকীলের কার্য্য করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি অন্ধ হইয়া যান। তখন তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব হয়। তিনি বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'ছায়াময়ী', 'কবিতাবলী', 'আশাকানন', 'বৃত্রসংহার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অন্ধ হওয়ার পর, হেমচন্দ্র যে সকল করুণরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার সহিত অন্ধকবি মিল্টন-রচিত অন্ধ স্যাম্সনের প্রাণস্পর্শী কাতরোক্তি তুলনা করা যাইতে পারে।

রাজকৃষ্ণ রায়

১২৬২ বঙ্গাব্দে রাজকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তিনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার এক বৈদ্য ভদ্রলোকের আশ্রয়ে বাস করিতেন। ভদ্রলোকটি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। যখন রাজকৃষ্ণ তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন হইতে তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রথম জীবনে কৃত্তিবাসের রামায়ণ তাঁহার আদর্শ ছিল।

তিনি বহু কবিতা ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকসমূহের মধ্যে 'বনবীর', 'নরমেধযজ্ঞ', 'প্রহ্লাদচরিত্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সেকালের থিয়েটারসমূহে নৈতিক সংস্কার আনয়ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

ভারতচন্দ্র রায়

হুগলী জেলার পেঁড়ো-বসন্তপুরে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। 'অন্নদা-মঙ্গল', 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'মানসিংহ' কবি ভারতচন্দ্রের রচিত। 'অন্নদামঙ্গল' বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ্। শ্লেষ কবিতা রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

সৈয়দ্ এম্দাদ্ আলী

আধুনিক যুগের প্রতিভাবান্ মুসলমান কবিদিগের মধ্যে সৈয়দ এমদাদ্ আলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কবিতা অতি মধুর। 'তাপসী রাবেয়া' ও 'ডালি' ইহার লিখিত।

নবীনচন্দ্র সেন

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলায় নওয়াপাড়া গ্রামে নবীনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গের একজন অতি প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁহার সাহিত্য জীবনের প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। 'অমিতাভ', 'কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস' ইত্যাদি এই কবিবরের লিখিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১২৭০ বঙ্গাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্.এ. উপাধিধারী ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড হইতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন।

নাটকরচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং ব্যঙ্গকবিতাপ্রণয়নে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চে। চিন্তাক্লিষ্ট বাঙ্গালীর ম্লানমুখে এরূপ "হাসির ফোয়ারা" ছুটাইতে আর কেহ সমর্থ হন নাই।

সেকালের কবিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর গুপ্ত, কবিবর হেমচন্দ্র ও নটরাজ অমৃতলালও বহু ব্যঙ্গকবিতা রচনাদ্বারা বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত ও বঙ্গবাসীর প্রাণ সরস করিয়াছেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল ইহলোক ত্যাগ করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত "যক্ষের আলয়" শীর্ষক কবিতা অতি মনোরম। বারংবার পাঠ করিলেও ইহা আমাদিগের নিকট চিরনূতন কবিতারূপে প্রতীয়মান হয়।